দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক উৎসবের দিনটি আজও প্রাসঙ্গিক

— পৃঃ ১১

শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক হিন্দুজাতির স্বাভিমানের প্রতীক

— পৃঃ ১৪

৭৮ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা।। ২২ জুন, ২০২৬।। ৭ আষাঢ়, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

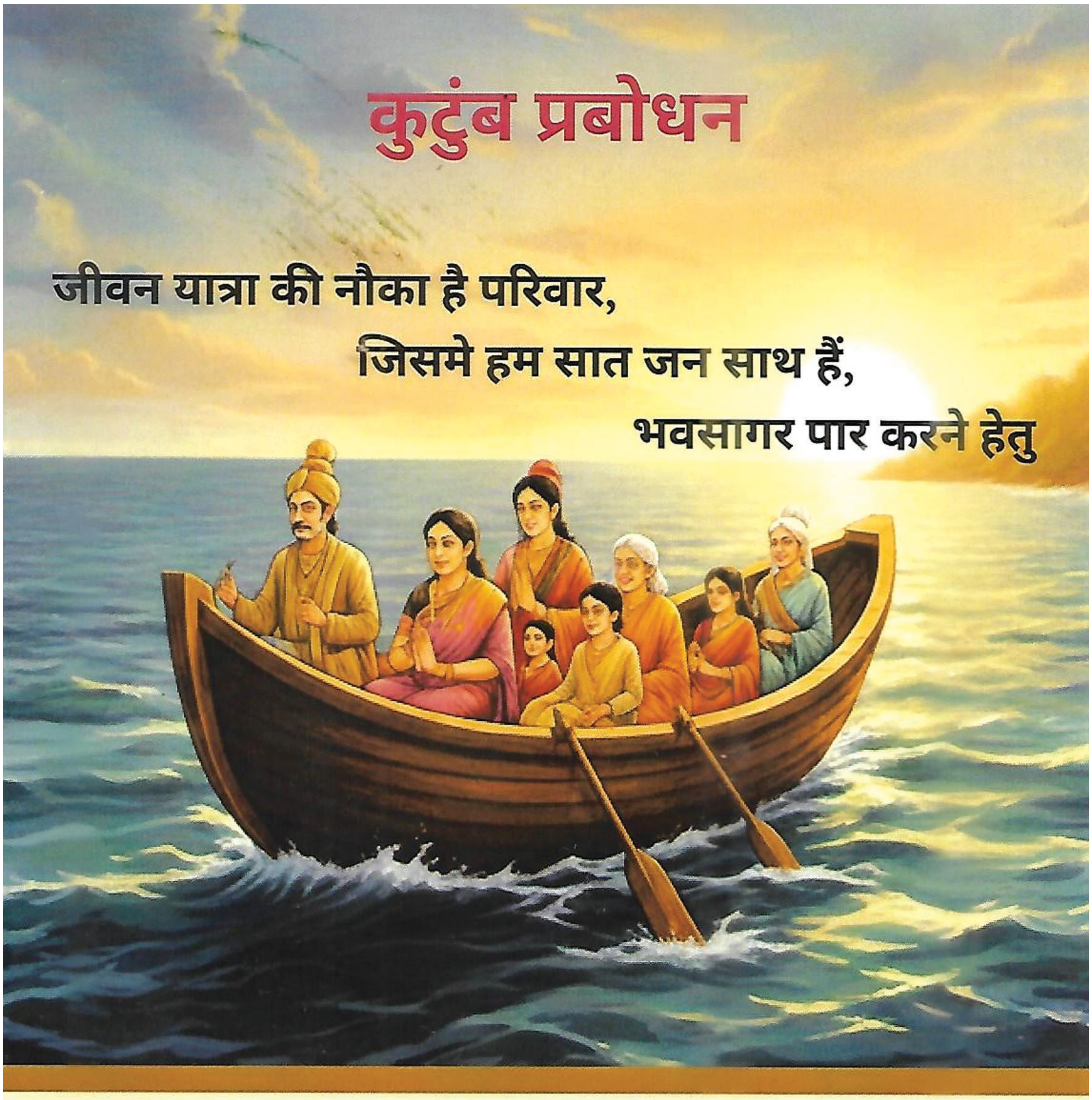

लक्ष्य

संयुक्त परिवार	संगठित, सशक्त, सुरक्षित परिवार
स्वस्थ परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
सुसंस्कृत परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
आदर्श परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা, ৭ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

২২ জুন - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

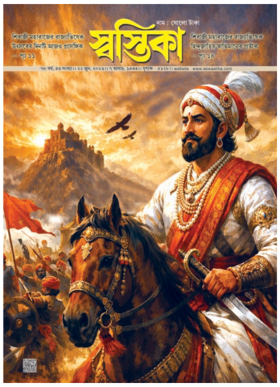

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

সাত দশকের বেড়া ভেঙে এগোনোই লক্ষ্য : বলছে কিন্তু দিচ্ছে কে? ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

আমি আছি দিদি... ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

ভারতে জনবিন্যাস পরিবর্তনের বিষয়টি সঙ্ঘ ও স্বস্তিকা পত্রিকাই জনসমক্ষে এনেছে ◻ রতন শারদা ◻ ৮

শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকের দিনটি আজও প্রাসঙ্গিক ◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ১১

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক হিন্দু জাতির স্বাভিমানের প্রতীক ◻ অমিত কুমার চৌধুরী ◻ ১৪

স্বারাজ্য সৈনিকে আত্মবলিদানে ঘোরখেণ্ড আজ পাবনখেণ্ডে পরিণত ◻ সারদা প্রসাদ পাল ◻ ১৬

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ২৬ জুন ◻ শালিহোত্র ◻ ১৮

হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব : বর্তমান প্রেক্ষাপটে ◻ ডাঃ শিবাজী ভট্টাচার্য ◻ ২৩

অম্বুবাচী ব্রত : মাহাত্ম্য ও দর্শন ◻ সরোজ চক্রবর্তী ◻ ৩১

মালদার গৌড়ে গৌড়েশ্বরীতলা ও শ্রীরামমন্দির ◻ প্রবীর কুমার রায় ◻ ৩৩

উগ্র প্রাদেশিকতা ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংহতি পরিপন্থী ◻ খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ◻ ৩৫

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর হাদি নাটকটাও জমলো না ◻ ৩৭

এক সুবর্ণ পথযাত্রী নবজাগরিত ভারত ◻ সৌমিত্র সেন ◻ ৩৯

অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন ও দেশভাগের ট্যাজেডি—শ্রীমার দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের আত্মপরিচয় ◻ সৈকত নিয়োগী ◻ ৪৩

ব্যালট বিপ্লবে রাজনৈতিক পরিবর্তন : তৃণমূলের পতনে পশ্চিমবঙ্গে অন্ধকার যুগের অবসান ◻ ড. বিবেকানন্দ চক্রবর্তী ◻ ৪৫

যখন চেনা শোষকই রাতারাতি 'তৎকাল বিজেপি' সাজে : পশ্চিমবঙ্গের তখন এক জলজ্যান্ত সংকট ◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ৪৮

গল্প কথায় ডাক্তারজী ◻ সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১-২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৫-৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

প্রকাশিত হবে
২৯ জুন
২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৯ জুন
২০২৬

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

যোগ ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের এক অমূল্য উপহার। এটি শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের প্রাচীন অনুশীলন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে ২০১৪ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২১ জুন দিনটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস রূপে ঘোষণা করে। এবছর যোগ দিবসে কলকাতায় উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় যোগ দিবসের বিস্তারিত আলোচনা থাকবে।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

‘এক-ধর্ম-রাজ্য হবে এ ভারতে’

মধ্যযুগের ভারতবর্ষ। হিন্দু সমাজ ইসলামি শাসনে আবদ্ধ। তখন ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজ চারটি মুসলমান শাসন— দিল্লির মোগলশাহি, দৌলতাবাদের নিজামশাহি, বিজাপুরের আদিলশাহি এবং গোলকুণ্ডার কুতুবশাহির অধীনে পদানত। তাহাদের অপশাসন ও অত্যাচারে হিন্দু সমাজ ঘোর নিরাশায় নিমজ্জিত। ইহার মধ্যে যে কয়েকজন অতি ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা ছিলেন তাহাদের না ছিল স্বাভিমান না ছিল স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কোনো সামগ্রিক চেতনা। ইহার মধ্যে কয়েকজন ক্ষমতাশালী রাজা ইসলামি শাসকদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া সুখে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। তাহাদের মনে স্বাভিমান বা স্বাধীনতার স্পৃহা বিন্দুমাত্র ছিল না। দেবালয় চূর্ণ অথবা নারীর সতীত্বহানি চক্ষুর সম্মুখে ঘটিতে দেখিলেও তাহাদের মনে কোনোরূপ বিকার সৃষ্টি হইত না। সেই কারণে হিন্দুদিগকে পদে পদে লাঞ্ছিত হইতে হইত। মঠ-মন্দির ধ্বংস হইত। নারীজাতির সম্ভ্রমহানি ঘটিত। প্রকাশ্যে ধর্মাচরণের অধিকারটুকু পর্যন্ত তাহাদিগের ছিল না। এহেন ঘোর অন্ধকার পরিস্থিতিতে নিজামশাহি পরবর্তীতে আদিলশাহি শাসকের অধীনে সামান্য একজন জায়গিরদার শাহজী ভোঁসলের পুত্ররূপে হিন্দুকুলবতংস ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের আবির্ভাব। বিধর্মী শাসকের অধীনে কর্মরত এক জায়গিরদারের পুত্র হইয়াও আপন প্রতিভাবলে শিবাজী মহারাজ এক স্বাধীন হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঘোর ইসলামি শাসনে নিরাশায় নিমজ্জিত হিন্দু সমাজে তিনি নবচৈতন্যের উন্মেষ ঘটাইয়াছিলেন। মাতা জীজাবাঈ এবং শিক্ষক দাদাজী কোণ্ডদেবের অনুপ্রেরণায় তিনি একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধায় পরিণত হইয়াছিলেন। ১৬৪৬ সালে মাত্র ষোড়শ বৎসর বয়সে পার্বত্য মাওয়ালি মিত্রগণের সহায়তায় আদিলশাহি শাসকের হাত হইতে তোরণা দুর্গের দখল লইয়াছিলেন। জীবদ্দশায় তিনি মুসলমান শাসকদের হইতে প্রায় তিনশত দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। মাতা জীজাবাঈয়ের ইচ্ছায় ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে রায়গড় দুর্গে তাঁহার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। ক্রুর ইসলমি শাসকদের ভয়ে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁহার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। অবশেষে বারাণসীর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গাগাভট্ট সেই অসাধ্য কার্যটি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক পর্বটি এমন একটি মুহূর্ত যাহা ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির ভাগ্য নির্ধারণ করিয়াছিল। দেশ-জাতি-ধর্ম ও সমাজ রক্ষার্থে হিন্দু সমাজকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

এই ঐতিহাসিক ক্ষণটির কথা স্মরণে রাখিয়াই লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে শিবাজী উৎসবের প্রচলন করিয়াছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই অনুষ্ঠানে ‘শিবাজী উৎসব’ নামক কবিতা রচনা করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। সেই কবিতার ছত্রে ছত্রে তিনি শিবাজী মহারাজের বন্দনা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, শিবাজী মহারাজের প্রতি অপশব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, দস্যু বলিয়া যাহারা গালি দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে মিথাবাদী বলিয়া অভিহিত করিয়া বাঙ্গালিদিগকে শিবাজী মহারাজের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া নবচেতনায় জাগ্রত হইতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক তিথিটিকে ‘হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব’ রূপে শতবর্ষ যাবৎ সমাজের মধ্যে উদ্‌যাপন করিয়া চলিয়াছে। বস্তুত, হিন্দুজাতি শিবাজী মহারাজকে গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক, হিন্দুকুলতিলক হিসাবে চিরকাল স্মরণে রাখিবে। একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু হিসাবে তিনি সকল ধর্মের মানুযের প্রতি সহনশীল ছিলেন। তাঁহার সেনাবাহিনী ও প্রশাসনে বহু মুসলমান ও ইউরোপীয় নিযুক্ত ছিলেন। হিন্দু স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং হিন্দু সংস্কৃতির মহান রক্ষক ছিলেন তিনি। পর্তুগিজরা তাঁহাকে ‘হিন্দু সিংহ’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। ভিয়েতনামি যোদ্ধাগণ শিবাজী মহারাজের গেরিলা যুদ্ধপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহা মুক্তকণ্ঠে তাহারা স্বীকারও করেন। ভারত তথা হিন্দুজাতির গৌরবের বিষয় যে, ভারত ও ইজরায়েলের মধ্যে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করিতে ইজরায়েলের কোনো শহরে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের একটি বিশালাকার মূর্তি স্থাপনের কথা ঘোষণা করিয়াছেন মুম্বইয়ে নিযুক্ত ইজরায়েলের কনসাল জেনারেল। বর্তমানের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষিতে বলা যাইতে পারে, বহু বৎসর পর বাঙ্গালিজাতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে সাড়া দিয়া শিবাজী মহারাজের ন্যায় নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ইসলামি শাসন-স্বরূপ এক ঘোর অপশাসনের অবসান ঘটাইয়াছে। তাই কবিগুরুর ভাষায় ‘এক-ধর্ম-রাজ্য হবে এ ভারতে’ এই কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যাইতে পারে।

সুভাষিতম্

অতিদানাৎ বলির্বদ্ধো হ্যাতিমানাৎ সুযোধনঃ।
বিনষ্টো রাবণো লৌলাৎ অতি সর্বত্র বর্জয়েৎ।। (চাণক্যনীতি)

অর্থ ঃ অতি দানে বলিরাজা পাতালে আবদ্ধ হয়েছিলেন, অতি অহঙ্কারে দুর্যোধনের পতন হয়েছিল, অতি লোভে রাবণ সবংশে নিধন হয়েছিলেন। সুতরাং অতি সবসময় বর্জন করা উচিত।

সাত দশকের কুশাসনের বেড়া ভেঙে এগোনোই লক্ষ্য

বলছে কিন্তু দিচ্ছে কি?

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

আচার্য চাণক্য তাঁর ভাবনায় প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির প্রবেশ ঘটিয়ে বুঝিয়েছিলেন যে, শাসকের কেন প্রবৃত্তির দাস হওয়া অনুচিত। আর কেনই-বা তা নিবৃত্তি অনুসারী হওয়া প্রয়োজন। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এই ভাবনা সাধারণভাবে গৃহীত হবে না। তাই রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত নতুন সরকারকে সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। প্রয়োজনে প্রবৃত্তির ক্ষতিকারক ভাবনা থেকে সরে আসতে হবে। তাই প্রতিনিধিদের সান্ধ্য টিভিতে যতটা কম দেখতে পাওয়া যায় তত মঙ্গল। তুলনায় মানুষের মুখোমুখি হওয়া অনেক বেশি প্রয়োজন।

পর পর দু'টি ভোটে হেরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রমাণ করেছেন যে, তিনি যোগ্য প্রার্থী ছিলেন না। ২০২১-এর উপনির্বাচনে গাজোয়ারি করে জিতেছিলেন। ওই পদ তার প্রাপ্য ছিল না। লজ্জার মাথা খেয়ে নিয়েছিলেন। ফলে পরাজয়ের পরেও তিনি পরাজয় মানতে নারাজ। পদের মোহ কতটা সাংঘাতিক হতে পারে সে নজির উত্তরসূরীদের কাছে রেখেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাই প্রথমেই অকপট জানিয়েছেন তিনি ফোটো শুট করতে ওই আসনে বসেননি। মন্ত্রীসভার অন্য সদস্যদের সে শিক্ষা নেওয়া উচিত। কয়েকদিনের ভিতরেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জীবন্মৃতের ছবিঘরের বাসিন্দা হয়ে যাবেন। যেমন হয়েছিলেন তার দুই পূর্বসূরী জ্যোতি বসু ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কংগ্রেসের উচ্ছিষ্ট হিসাবে আবির্ভাবের ২৮ বছর পর ফেলে দেওয়া থালায় আহার করতে তিনি কংগ্রেসের দিকে হাত বাড়িয়েছেন। তদন্ত আর জেল যাত্রার হাত থেকে বাঁচতে পাশ্চাত্যবাদীদের হাতের পুতুল হতে চাইছেন। কংগ্রেস 'ফুটো ব্যাগ'। পয়সা রাখলে পড়ে যাবে। তারা (পিসি-ভাইপো) কংগ্রেসের আশ্রয়ে থেকে জেল যাত্রাকে কম অনিশ্চিত করতে চাইছেন।

প্রশাসক হিসেবে বিজেপি এরাজ্যে 'ব্যতিক্রমী' হয়ে উঠতে পারবে। না পারার কোনো কারণ যে নেই— মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকার ইতিমধ্যেই তার প্রমাণ দিয়েছে। প্রধানভাবে মুসলমান তোষণের সুদীর্ঘ ইতিহাসের প্রশ্নে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে এরাজ্যের নবনির্বাচিত সরকার। বেআইনি অনুপ্রবেশ আর হকার থেকে রাজ্যকে দখলমুক্ত করতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। স্থবিরতা আর আপোশ-তোষণের রাজনীতিকে ভিত্তি করেই এরাজ্যে শূন্যতার ভাবনা তৈরি হয়। ধীরে ধীরে এই বিশ্বাস তৈরি হয় যে, কোনো সরকার ভালো হতে পারে না। মুখে যা বলে কাজে তা করে না। রাজ্যের অলিতে-গলিতে এতকাল তাই শোনা গিয়েছে। তবে এর উল্টো ভাবনাটি অতি ধীরে হলেও শক্তি আর গতি পাচ্ছে। প্রায় শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া বিদেশি বামপন্থীরাই এই হকার আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে তাদের খেপানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

তারা ভুলে গিয়েছে যে, তাদের এক পিতৃপুরুষ এই হকার উচ্ছেদ (১৯৯৫-৯৬-এর 'অপারেশন সানশাইন') -এর ঋত্বিক ছিলেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় এটাই পাবলিক সিনিসিজম্ বা জন-অবিশ্বাস। আর তাকে উসকাচ্ছে বিদেশিদের দল। যে কোনো শাসকের জন্য তা ক্ষতিকর। বিজেপি পূর্ববর্তী তিন শাসকের ভিতর পাশ্চাত্যবাদী কংগ্রেস আর বিদেশি বামপন্থীরা যে রাজনীতি করেছে তা স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময় বা তার আদলে পরবর্তী পর্যায়ে তৈরি বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। দেশীয় আর রাষ্ট্রবাদী ভাবনার সঙ্গে তার মিল ছিল না। এই দেশের সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশ যে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিচ্ছিন্ন নয় সেটাই এরাজ্যের ভোটার আর মানুষকে নতুন করে এই সরকারকে বোঝাতে হবে। তাই নতুন সরকারের পাশে আর সঙ্গে সকলের থাকা এই মুহূর্তে সব থেকে জরুরি।

নতুন ভাবনাকে সঞ্জাত করতে হবে। যে অনাবশ্যকতার পাহাড় গড়ে উঠেছে তাকে অগ্রাহ্য করেই নতুন সরকারকে এগোতে হবে। গতানুগতিকতাকে দূরে সরিয়ে ভোটার আর মানুষকে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে হবে। এটা ধরে নেওয়া মস্ত ভুল হবে যে, বিজেপি পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনো ব্যতিক্রমী সরকার নয়। এটা ভাবা ভুল যে, তার কাছ থেকে ব্যতিক্রমী ভাবনা আর ব্যবহার পাওয়া সম্ভব নয়। অনেকে মনে করেন যে, পুরোনো শাসক দলকে যেনতেনপ্রকারে কাঁধ ঝেড়ে ফেলাটাই এরাজ্যের ভোটারদের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু নতুন শাসক দলের কাছ থেকে তাঁদের কোনো আশা ছিল না। এহেন ভাবনা প্রচারকারীরা অচিরেই ভুল প্রমাণিত হবেন। পরিবর্তনের ভাবনা যে নেতিবাচক নয় সেটা প্রমাণের সময় আগত। কোনো বহুমাত্রিক আর দায়িত্বশীল সরকারের কাছে তাই প্রধান আর দ্বিতীয় বলে কোনো কাজ হয় না। সে প্রশ্ন তোলা মূর্খামি। সব কাজ সমান গুরুত্বপূর্ণ। সেটাই হলো 'বলছে আর দিচ্ছে'-র সমন্বয়।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

আমি আছি দিদি...

ফেলটুসেযু দিদি,

রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে গেলেন। কিন্তু কেন বলুন তো দিদি! ডবল ইঞ্জিন সরকার হয়েছে বলে! না দিদি, এটা বুঝিয়ে দিতে যে আপনি এক নম্বরের ফেলটুস। আমি কিন্তু বারবার বলেছি ফালতু রাজনীতি না করে মানুষের কাজ করুন, রাজ্যের উন্নয়ন করুন। কিন্তু আপনি আমাকে তো পাত্তাই দিলেন না। আমি তো কতবার বলেছি, আপনার কাজ রাজ্যের উন্নয়ন করা। কাজ তৈরি করা। আর আপনি সারা বছর শুধু ভোটের অঙ্ক করে গেছেন। আর তাতে অঙ্কে তো ফেল করেছেনই, এগ্রিগেটেও ফেল। তবু মনে রাখবেন, আমি আছি।

জানি আমি যেমন লিখছি যে, আগেই সতর্ক করেছিলাম তেমনটা আপনার প্রিয় অনেক ভাই-বোনই বলছে। যাঁরা ইতিমধ্যেই বিছানাপত্তর গুছিয়ে, আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে, আর যাঁরা কোথাও যেতে পারেনি তাঁরা জেলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এখনও যাঁরা বাইরে সকাল-সন্ধ্যা তাঁদের ডিমাতঙ্ক তাড়া করছে। আপনি কিন্তু মোটেও বাড়ি থেকে বের হবেন না। বরং আমি নিয়মিত মানে প্রতি সপ্তাহে খবর দেব কোথায় কী কী হচ্ছে। আমি আছি দিদি।

শুনে রাখুন আরবিআই গভর্নর অন্য রাজ্যের মানে বিজেপি না হলেও তাদের সঙ্গে দেখা করে রাজ্যের অর্থনৈতিক হাল নিয়ে খোঁজ খবর নেন। আমার মনে হয়, আপনার কাছে আসতে চাননি কিংবা আপনি পাত্তাই দেননি।

সম্প্রতি আমি দিল্লি গিয়েছিলাম। আর সেই সময়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। বেশ কিছুক্ষণ কথা হয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতীন গড়কড়ির সঙ্গে। তিনি খুব তাড়াতাড়ি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন। এর পরে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জেপি নাড্ডার সঙ্গেও আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছে। সকলের সঙ্গেই আমি শুধু পশ্চিমবঙ্গের আগামী নিয়ে কথা বলেছি। আর তাতে যা জানতে পেরেছি তা বলব।

রাজ্যে কেমন ভাবে বিশাল কিছু হতে চলেছে জানেন! জাহাজ ও রেলমন্ত্রক বিপুল টাকার প্রকল্পের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। করণ আদানি মানে গৌতম আদনির পুত্রের সঙ্গে বৈঠকেও বড়ো বিনিয়োগের আশ্বাস মিলেছে। আপনি মানবেন না তবু বলছি, বিজেপি তথা মোদীর জন্য এবারের পশ্চিমবঙ্গে জেতাটা রাজনৈতিক লক্ষ্যের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গকে ঘিরে স্ট্র্যাটেজিক লড়াইও লড়তে চান। পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের ছবি বদলে দিতে পশ্চিমবঙ্গকেই কেন্দ্র বানাতে চান প্রধানমন্ত্রী।

তাই তো নরেন্দ্র মোদী, শুধু দেশকে নয়, পশ্চিমবঙ্গকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে এবারের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠান দেশের অন্য কোথাও নয়, কলকাতাকে বেছেছেন।

এবার শুনুন কী কী হতে চলেছে। রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিপুল বিনিয়োগ টানতে এবং যুবসমাজের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে কলকাতায় বিমানবন্দরে দেশের প্রথম সারির পরিকাঠামো ও নির্মাণ সংস্থা এল অ্যান্ড টি-র চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস এন সুব্রহ্মণ্যেমের এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হন। আসছে আমুল। প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে মেগা প্রকল্প আনতে চলেছে দেশের স্বনামধন্য দুগ্ধ উৎপাদক সংস্থা আমুল। হাওড়ার সাঁকরাইলে তৈরি হওয়া কারখানা থেকে দৈনিক ১০ লক্ষ কিলোগ্রাম দই, লস্যি, ঘোল উৎপাদন হবে বলে। আমুল দেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং নির্ভরযোগ্য একটি ব্র্যান্ড। দুধ উৎপাদনে দেশে সর্বোচ্চ স্থানে আমুল।

১৯৪৬ সালে আনন্দ মিল্ক ইউনিয়ন লিমিটেড কোম্পানির হাত ধরে দেশের বড়ো অংশের গোপালকরা উপকৃত হচ্ছে। নতুন প্রজেক্টের মাধ্যমে হাওড়া জেলায় বড়ো কর্মসংস্থানের সুযোগ সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বড়ো অংশের গোপালকেরা উপকৃত হবে।

রাজ্যে নতুন সরকার গড়তেই বিনিয়োগে আগ্রহ দেখালো আদানি গোষ্ঠী। কর্ণধার গৌতম আদানির পুত্র করণ আদানি নবান্নে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেন। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে দু'জনের বৈঠক চলে। আদানি গোষ্ঠীর পক্ষে রাজ্যে বন্দর, ডেটা সেন্টার, বিদ্যুৎ ও রাস্তা-সহ পরিকাঠামোয় বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। এক সময়ে তাজপুরে গভীর সমুদ্রবন্দরে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছিল এই গোষ্ঠী। টেন্ডারে অংশ বরাত পাওয়ার পরেও তারা ওই প্রকল্প থেকে সরে দাঁড়ায়। আপনি তো সবই জানেন। কোন কারণে চলে গেছিল।

তাজপুরে বন্দর বানানো সম্ভব নয় বলে আগেই জানিয়েছিল আদানিরা। সেটা আর প্রকাশ্যে আনেননি সততার প্রতীক আপনি। নতুন সরকার ঠিক করেছে তাজপুরের বদলে দাদনপাত্রবাড়ের সরকারি জমিতে এই মেগা প্রকল্প হবে। আপনি কিন্তু সব হয়ে গেলে একদিন দেখতে যাবেন। আমিও থাকব আপনার সঙ্গে। জানি, কেউ নেই নিয়ে যাওয়ার।

ও দিদি, দিদি গো, শুনলাম সিঙ্গুরেও টাটাকে ফেরানোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। ধর্নায় বসবেন নাকি! একদিন গিয়ে মঞ্চ বাঁধার জায়গাটা দেখে এলে কেমন হয়! আমি তো আছি। □

অতিথি কলম

রতন শারদা

ভারতে জনবিন্যাস পরিবর্তনের বিষয়টি সঙ্ঘ ও স্বস্তিকা পত্রিকাই জনসমক্ষে এনেছে

গত বছর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে দিক্‌নির্দেশ করেছিলেন, তার উপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন (হাই-পাওয়ারড্) কমিটি গঠনের বিষয়ে ঘোষণা করেছেন। বহু প্রতীক্ষিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ও চিন্তার বিষয়— এই কমিটি গঠনের ঘোষণার সঙ্গে জড়িত। সেটা হলো ভারতের জনবিন্যাসের পরিবর্তন বা 'ডেমোগ্রাফিক শিফ্‌ট'। এ বিষয়ে ভারতের আভ্যন্তরীণ নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে যে ফাঁকফোকরগুলো রয়েছে, সে বিষয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বহুদিন ধরেই সরব। অনুপ্রবেশ ও বেআইনি অভিবাসনের ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে জনবিন্যাসের যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন হচ্ছে, সেই ব্যাপারগুলো খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করবে উপরোক্ত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি। জনবিন্যাসের অস্বাভাবিক কারণ অনুসন্ধানের পাশাপাশি তা রোধ করার লক্ষ্যে কী কী সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন তার সুপারিশও করবে এই কমিটি। কমিটি কাজ করবে যাতে দেশের সীমান্ত সুরক্ষিত থাকে এবং সামাজিক স্থিরতা বজায় থাকে।

গত বছর প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টামণ্ডলীর পক্ষ থেকে ড. শমীকা রবির নেতৃত্বে প্রকাশিত হয় 'শেয়ার অফ রিলিজিয়াস মাইনরিটিজ : এ ক্রস-কান্ট্রি অ্যানালিসিস (১৯৫০-২০১৫)'-শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র। এই গবেষণাপত্রটিতে ভারত-সহ পৃথিবীর ১৬৭টি দেশের ধর্ম ও বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি আধারিত সমাজ ও সম্প্রদায়গুলির জনবিন্যাসের পরিবর্তনের বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা হলো— ১৯৫০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের জনসংখ্যা প্রায় ৭.৮২ শতাংশ কমেছে। ওই একই সময়কালে মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৪৩.১৫ শতাংশ। ভারত সরকার স্বীকৃত অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, যেমন— খ্রিস্টান, শিখ ইত্যাদি; তাদের জনসংখ্যা খুব কম হারেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকেই উপরোক্ত বিষয়টিকে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে পর্যালোচনা-সহ বারবার এ বিষয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করে এসেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। এই বিষয়ে সঙ্ঘের পক্ষ থেকে গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাব এবং প্রচারিত বিভিন্ন বিবৃতিতে বিভিন্ন সময় নানা পর্যালোচনা প্রতিভাত হয়েছে। এই প্রতিবেদক রচিত পুস্তক 'কনফ্লিক্ট রেজোলিউশন— দ্য আরএসএস ওয়ে' থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি এই নিবন্ধে প্রাসঙ্গিক হবে।

কয়েক দশক ধরে উচ্চারিত সতর্কবাণী : ১৯৬৪ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু শরণার্থীদের বিষয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রতিনিধি সভা গৃহীত সেই প্রস্তাবে বর্ণিত হয় যে, কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা 'সুপ্ত বিপদ' হিসেবে অবস্থান করছে এবং পঞ্চম বাহিনীর মতো কার্যকলাপ করছে। ওই প্রস্তাবে বর্ণিত হয় যে— 'উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল ১৯৫০ সালে যেমন পরামর্শ দিয়েছিলেন, তেমন পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমাদের সরকারকে প্রস্তুত থাকতে হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দা নির্দেশ দেন যে, ২৫ লক্ষ পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীকে ভারত থেকে বহিষ্কার করার জন্য কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে এবং এর সঙ্গে ভারতে যাতে আর অনুপ্রবেশ না ঘটে তার জন্যও কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। সর্দার প্যাটেল ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দা-র নির্দেশ কার্যকর করতে হবে। উপরোক্ত সরকারি পদক্ষেপের কিছু কিছু বিষয়ে অসম সরকারের বিরোধিতা, ভারত ও পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রস্তাবিত বৈঠক এবং সেই বৈঠকের ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ পাকিস্তানের সম্মতিদান হয়তো ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দার উত্থাপিত প্রস্তাবকে খারিজ করার অপপ্রয়াস হতে পারে। এই বিষয়গুলি থেকে ওই প্রশাসনিক নির্দেশের প্রয়োগ সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হয়। এ ব্যাপারে শ্লথগতি বা নরম মনোভাবের পরিণাম ভয়ানক হতে পারে। পাকিস্তানি গুপ্তচর ও পঞ্চম বাহিনীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।'

পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট জমানায় ১৯৯১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারির একটি ঘটনা তৎকালীন প্রশাসক ও নীতি-নির্ধারকদের আসন হয়তো টলিয়ে দিতে পারত। কিন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে ঘটনাটিকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যায় তৎকালীন প্রশাসন। জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক পত্রিকা 'স্বস্তিকা' ছাড়া আর কোনো সংবাদমাধ্যমই এই ঘটনাটির বিষয়ে কোনোরকম আলোকপাত করেনি। ১৯৯১ সালে তাদের গৃহীত প্রস্তাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ জানায়— 'এটা খুবই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা যে, শত শত বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী অত্যন্ত ঔদ্ধত্যের সঙ্গে মধ্য কলকাতায় অবস্থিত প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশি মোহাজির সঙ্ঘের ব্যানারে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে। ২৭ জন বাংলাদেশি মুসলমানের হস্তাক্ষর-সংবলিত একটি লিফলেট বা প্রচারপত্রও তারা বণ্টন করেছে। দেশের আইন-কানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিয়ে তারা জানায় যে, এক লক্ষেরও বেশি

বাংলাদেশি মুসলমান কলকাতার মধ্যে ও তার আশেপাশে ইতিমধ্যেই বসবাস করছে এবং অন্য অনেকে মুম্বাই, দিল্লি, আমেদাবাদ এবং অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তারা দাবি করেছে যে, তাদেরকে ভারতের নাগরিকত্ব দিতে হবে। এই মর্মে তারা মিছিলও করে। এই অভাবনীয় ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এদের পিছনে প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ও বেআইনি রক্ষাকবচ রয়েছে। সংবাদমাধ্যমের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে পরে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান যে, এরকম কোনো মিছিল বা প্রচারপত্র (লিফলেট)-এর বিষয়ে তাঁর জানা নেই।'

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ জনবিন্যাস পরিবর্তনের ব্যাপারে তাদের উদ্বেগের কথা বছরের পর বছর ধরে ব্যক্ত করে আসছে। সঙ্ঘ মনে করে— প্রশাসনিক নীতি অনুযায়ী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে যে সব সম্প্রদায়ের প্রবল অনীহা, তাদের মধ্যে জনশিক্ষা প্রসারণের লক্ষ্যে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। ১৯৯৭ সালে সঙ্ঘের দ্বারা গৃহীত একটি প্রস্তাবে জানানো হয় যে, 'অনিয়ন্ত্রিত অনুপ্রবেশের ফলে সীমান্তবর্তী জেলাগুলো গুরুতর চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে— বিশেষত ভারতের পূর্ব সীমান্তে। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে যে বিস্ফোরক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে আমরা গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত করছি। প্রথম থেকেই অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা মত পোষণ করি যে, এইসব অঞ্চলে যা ঘটছে তা তাৎক্ষণিক উসকানিজাত কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। এসবই অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং দীর্ঘমেয়াদি চক্রান্তের ফল।'

২০০১ সালের জনগণনা থেকে জনবিন্যাসের যে বিপদ প্রতিভাত হয়েছে, সেই বিষয়ে ২০০৪ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সমিতি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। ২০০১ সালের জনগণনা অনেক বিপজ্জনক তথ্য সামনে নিয়ে আসে। দেখা যায় যে, জনবিন্যাসের পরিবর্তনের ফলে দেশের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হতে পারে। এটা মনে রাখতে হবে যে, ভারতের অনেক জায়গায় হিন্দু-মুসলমানের জনবিন্যাসের আনুপাতিক বৈষম্যের কারণেই দেশ ভাগ হয়েছিল। ৫৭ বছর পরে আবার দেশের বিভিন্ন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এই কারণে আশাবাদী যে, তারা দশকের পর দশক ধরে দেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য একটি বহুমুখী, সুসংবদ্ধ নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে নিরন্তর ভাবে যে প্রচারাভিযান চালিয়ে এসেছে, তা অবশেষে জাতীয় স্তরে গৃহীত সিদ্ধান্তে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

স্থানে জনবিন্যাসের ভারসাম্যহীনতা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের লাগোয়া অসমের ছয়টি জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলায় হিন্দুরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও অসমের চারটি জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের সাতটি জেলায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু হওয়ার পথে। এর কারণ বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে বেআইনি অনুপ্রবেশ। নেপালের সীমান্তবর্তী উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের জেলাগুলিতে মুসলমান জনঘনত্ব ভীষণ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জেলাগুলিতে মুসলমানদের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ থেকে ৬৮ শতাংশ। বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত যেন একটি 'মুসলিম করিডোর' তৈরি হয়ে গিয়েছে— যার স্বপ্ন দেখেছিলেন ভারত ভাগের কারিগর জিন্না। ১১টি রাজ্যে এক দশকে খ্রিস্টানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ৩০ শতাংশেরও বেশি। ৯টি জেলায় এক দশকে মুসলমানদের বৃদ্ধির হার ৩০ শতাংশের বেশি।

একটি বৃহৎ অংশের বুদ্ধিজীবী ও সংবাদমাধ্যম এইসব বিষয়গুলিকে কার্পেটের তলায় চালান করে দিয়েছে; কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এই তথ্যগুলো দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেছে। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ভোটব্যাংকের কথা ভেবে এই বিষয়গুলিকে এড়িয়ে যাচ্ছে। ওই প্রস্তাবে বলা হয় যে, (১) হিন্দুধর্মের মানুষ-সহ বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতিজাত সব সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য একই রকম জন্মনিয়ন্ত্রণের নীতির অভাব। (২) ধর্মান্তরণ। (৩) বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশ।

ওই বিষয়গুলি বিবেচনা করে সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সমিতি দাবি জানায় যে— (১) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য 'ইউনিফর্ম পপুলেশন কন্ট্রোল পলিসি', অর্থাৎ সকলের জন্য একই রকম জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রণয়ন করতে হবে। (২) ধর্মান্তরণ রোধের লক্ষ্যে প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে কার্যকরী আইন প্রণয়ন করতে হবে। (৩) অনুপ্রবেশ বন্ধের লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণ, ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দেওয়া এবং তারপর তাদের বিতাড়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ভারসাম্যহীনতা দেখে ২০১৫ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে—'২০১১ সালের জনগণনাকে হিন্দু সমাজ ও বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতিজাত সম্প্রদায়ের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণের পর অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী মণ্ডলী মনে করে যে, দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। অনুপ্রবেশ ও ধর্মান্তরণের কারণে হিন্দুসমাজ-সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের বিপুল পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে এবং তার ফলে জনবিন্যাসের ভারসাম্য ধ্বংস হচ্ছে। বিশেষত সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে বেড়ে চলা এই জনবিন্যাসগত ভারসাম্যহীনতা গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতি দেশের ঐক্য ও সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে বিপদস্বরূপ; দেশের সাংস্কৃতিক পরিচিতি ধ্বংসের কারণ।'

এই প্রস্তাবে আরও বলা হয়— 'অসম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে মুসলমান জনসংখ্যা হারের বৃদ্ধি দেশের গড় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে

গিয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের কারণেই এটা ঘটছে। সুপ্রিম কোর্ট গঠিত উপমন্যু হাজারিকা কমিশনের রিপোর্ট থেকেও এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। অনুপ্রবেশকারীরা ভারতীয় নাগরিকদের অধিকারে ভাগ বসাচ্ছে, তারা আমাদের দেশের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে হিন্দুসমাজ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার অনুপাতের প্রেক্ষিতে এক বিষম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যেমন— ১৯৫১ সালের জনগণনা অনুযায়ী অরুণাচল প্রদেশে ভারতে উদ্ভূত ধর্মাবলম্বী ও মতাবলম্বী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৯৯.২১ শতাংশ। ২০০১ সালে তা কমে হয় ৮১.৩ শতাংশ। ২০১১ সালে তা আরও কমে দাঁড়ায় ৬৭ শতাংশ। ২০০১ থেকে ২০১১--- এক দশকে অরুণাচল প্রদেশে খ্রিস্টান জনসংখ্যা বাড়ে ১৩ শতাংশ। একই রকম ভাবে মণিপুরে ১৯৫১ সালে ভারতে উদ্ভূত ধর্মাবলম্বী ও মতাবলম্বী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ৮০ শতাংশের বেশি, যা ২০১১ সালে কমে দাঁড়ায় ৫০ শতাংশে। এই রাজ্যের অনেক জেলায় খ্রিস্টানদের এই অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলো বিভিন্ন কায়েমি স্বার্থসম্পন্ন গোষ্ঠীর দ্বারা অত্যন্ত সংগঠিত ও সুপরিকল্পিত ধর্মান্তরণের ফল। অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী মণ্ডলী জনবিন্যাসের এই ভারসাম্যহীনতার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নিবেদন করছে— জাতীয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি যেন নতুন করে প্রণয়ন করা হয়। জনবিন্যাসগত ভারসাম্যহীনতার কারণে দেশের সম্পদের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়ছে তার ওপর নজর রাখতে হবে। বেআইনি অনুপ্রবেশকে সর্বতোভাবে নির্মূল করতে হবে। নাগরিকদের জাতীয় পঞ্জীকরণ (ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন্স) তৈরি করতে হবে যাতে এইসব অনুপ্রবেশকারীরা নাগরিকত্বের অধিকার অর্জন করতে না পারে এবং এদেশে জমি-বাড়ি ক্রয় করতে না পারে।'

সতর্কীকরণের ফলস্বরূপ নীতি প্রণয়ন : সেকুলার রাজনীতিবিদরা মনে করেন যে, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ইস্যু তুললে বা বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রসঙ্গ ইত্যাদি উঠলে তারা নির্বাচনে হেরে যাবেন। মুসলমান ভোটব্যাংক সরে যাওয়ায় সেকুলার রাজনীতিবিদের ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার সর্বশেষ উদাহরণস্বরূপ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কথা বলা যায়। ২০১৬ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির অসম জয়ের আগে ওই রাজ্যেও এই ধারণাই চলত। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে ২০২৬ সালে বিজেপি-কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ ও অসম জয় এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের দিক্‌নির্দেশ করছে। এক্ষেত্রে সেকুলার রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিপরীতমুখী ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ হিন্দু ভোটের একত্রীকরণ ঘটেছে। তবে হিন্দু ভোটের এই একত্রীকরণ কিন্তু দেশকে জনবিন্যাসের বৈষম্যের বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন যে কমিটি তৈরি করা হয়েছে তাদের কাজ হলো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগে সবদিক খুঁটিয়ে যাচাই করে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়গুলির মধ্যে জনবিন্যাসগত ভারসাম্যহীনতার কারণগুলির বিচার-বিশ্লেষণ। তাদের আরও দেখতে হবে যে, কী কী উপায়ে এই বেআইনি অনুপ্রবেশ ঘটছে; কী কী সংগঠিত পদ্ধতিতে অনুপ্রবেশকারীদের স্থায়ী বসতি গড়ে উঠছে এবং তার ফলে কী কী সামাজিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশগত পরিবর্তন ঘটছে। এছাড়াও এই কমিটিকে নির্দিষ্ট সময়সীমা-ভিত্তিক সমাধানের পথও বাতলে দিতে হবে, যাতে থাকবে— সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণ ও বিতাড়ন এবং এইসবের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ। কমিটির কাজ হলো--- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী সমাধান। এটি কোনো রাজনৈতিক বার্তা বা বিবৃতি নয়; এটি জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এই কারণে আশাবাদী যে, তারা দশকের পর দশক ধরে দেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য একটি বহুমুখী, সুসংবদ্ধ নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে নিরন্তর ভাবে যে প্রচারাভিযান চালিয়ে এসেছে, তা অবশেষে জাতীয় স্তরে গৃহীত সিদ্ধান্তে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র নির্দেশে উপরোক্ত কমিটি জরুরি ভিত্তিতে কাজও শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে এবং এই বিষয়ে সুষ্ঠু নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যেই ওই কমিটি কাজ করবে। স্বচ্ছতার সঙ্গে এই প্রক্রিয়ায় কাজ অব্যাহত থাকলে অচিরেই বিভাজনের রাজনীতি দূর হবে। এর সঙ্গে অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশকারীমুক্ত হয়ে পুনরায় বিভক্ত বা টুকরো টুকরো হওয়ার সম্ভাবনা থেকেও রক্ষা পাবে ভারত।

(লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক)

নাম পদবী পরিবর্তন

আমি Chittaranjan Patra S/o Amarendra Patra, নিবাস— গ্রাম ও পোস্ট অফিস : কোদালিয়া; ধর্মতলা রোড; রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভা, ওয়ার্ড নং : ২০, থানা : সোনারপুর, পিন কোড : ৭০০১৪৬, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগণা। ২০০১ সালে ভবানীচরণ চক্রবর্তী (পিতা : বিনয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী)-র থেকে ১ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাণ জমি ক্রয় করি। ২০০১ সালে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, সোনারপুর-এ রেজিস্ট্রিকৃত (দলিল নং : ৬৫৭৬, বুক নং : ১, ভল্যুম নং : ১১০, পৃষ্ঠা : ৩৬৭-৩৭২); মৌজা : কোদালিয়া, থানা : সোনারপুর স্থিত এই জমিটির খতিয়ান নং : ৩৬৭, আর.এস. দাগ নং : ১৩১৮, জে.এল. নং : ৩৫, তৌজি নং : ১২০। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড ও প্যান কার্ডে আমার নাম Chittaranjan Patra পিতা : Amarendra Patra নথিবদ্ধ থাকলেও উক্ত দলিলে আমার নাম ভুলবশতঃ Chittaranjan Patra-র পরিবর্তে Chitta Patra এবং আমার পিতার নাম ভুলবশতঃ Amarendra Patra -র পরিবর্তে Amalendu Patra নথিভুক্ত হয়েছে। উক্ত দলিলে আমার নাম ভুল করে Chitta Patra থাকায় গত ২১/১১/২০০৬ তারিখে পুর শাসক ও নিবন্ধক, সপ্তম কোর্ট, কলিকাতা (Metropoliton Magistrate and Registrar, Calcutta)-র এফিডেভিট (নং : 935) বলে আমি Chittaranjan Patra ও Chitta Patra এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হলাম। আমার প্রকৃত নাম Chittaranjan Patra পিতা : Amarendra Patra।

শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক উৎসবের দিনটি আজও প্রাসঙ্গিক

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

ত্রি-সার্ধ শতবর্ষ অতিক্রম করেছে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকের দিনটি। জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্র-ক্ষত্রিয়-কুলাবতংস ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ রাজ্যাভিষিক্ত হন। দুর্ধর্ষ ইসলামি শক্তির সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করে হিন্দুশক্তির জয়ের দিনটির স্মৃতিচিহ্ন ধারণ করে রয়েছে জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। সেই শুভক্ষণে মহারাষ্ট্রের রায়গড় দুর্গে অসামান্য দূরদর্শী এক হিন্দু যোদ্ধা সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়ে পরাধীন ভারতবর্ষের মাঝে এক স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে তুললেন। এ যে কত বড়ো জয়, ভাবা যায় না। এই সমারোহটির ফলশ্রুতিতে রক্ষা পেল হাজার হাজার বছরের সনাতনী ভারত-সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ, পুনরুজ্জীবিত হলো বেদ-বিদ্যার মণিমাণিক্য, রক্ষা পেল গো-ব্রাহ্মণ, হিন্দু তীর্থের ধ্বজপতাকা। হিন্দুধর্মের বিজয়বৈজয়ন্তী যদি সে সময়ে অর্থাৎ সপ্তদশ শতকে পুনরায় উড্ডীন না হতো, চিরকালের জন্য হারিয়ে যেত এই উচ্চ দর্শনের ধারা। পৃথিবী হয়ে উঠতো বাকিদের লড়াই এবং দখলের ক্ষেত্র। ভারতীয় মহাপুরুষের মহত্ত্ব প্রকাশ করবার জন্য অবশিষ্ট থাকতেন না কেউ। শিবাজী মহারাজের সীমাহীন সাহস ও সৌকর্যের সার্থকতা এই কারণেই।

মুঘল রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেও যে আবার হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করা সম্ভব, দেখিয়ে দিয়েছেন ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ।

ভারতের হিন্দুধর্ম-বিরোধী ইতিহাসবিদ এবং শিক্ষামন্ত্রীরা সুবিচার করেননি বলেই শিবাজী সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে অসমর্থ্য হয়েছে স্বাধীন ভারতের বর্তমান প্রজন্ম। মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে ঢক্কানিনাদের মাঝে শিবাজীকে রাখা হয়েছিল 'বনসাই'য়ের মতো ছেঁটে। ব্রিটিশ ভারতের কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'শিবাজী উৎসব'-এর আয়োজন এবং রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটি না পড়লে হয়তো ছত্রপতির প্রতিভা ও মৌলিকতা ভারতবাসীর হৃদয়ঙ্গম হতো না। প্রয়াগের অক্ষয় বটের মতো মৃত্যুহীন হিন্দু জাতির প্রাণ 'ফেকড়ি'র মতো পুনরায় গজিয়ে উঠেছিল শিবাজীর ধর্মরাজ্য স্থাপনের মধ্যে দিয়ে, আর এই ক্ষাত্রধর্মে শক্তি জোগালেন সাধুসমাজের নেতা 'মহাসমর্থ' গুরু রামদাস।

শিবাজীর তপস্যাতেজের রূপ কি দেখেছে বাঙ্গালি হিন্দু? বুঝেছে কি সেই রুদ্রলীলা? একদিন মারাঠার প্রান্ত থেকে ভৈরব রবে ধর্মরাজ শিবাজী আমাদের ডাক দিয়েছিলেন! চমকেছিল তাঁর কৃপাণদীপ্তি! মৃত্যুহীন বাণী-রূপ এনে দিয়েছিল নতুন প্রভাত। 'একধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এই সম্বলই ছিল তাঁর মহাবচন। সেদিন যদি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে না থাকে বাঙ্গালি, তবে রাবীন্দ্রিক ভাষায় আজই বলার সময় এসেছে—

"মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙ্গালি, এক কণ্ঠে বলো
'জয়তু শিবাজী'।
মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙ্গালি, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসব সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পুরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।"

তিনি ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ। তিনি মধ্যযুগীয় ভারতে হিন্দু রাজা হয়ে একটি অসাধ্য সাধন করলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধী হয়ে বিক্ষিপ্ত পরাজিত এক জাতিকে নবজীবন দিলেন, স্বাধীনতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন হিন্দুকে, শ্রেষ্ঠ প্রশাসক হিসাবে প্রমাণ করে দিলেন হিন্দুরাষ্ট্রের সমস্ত বিভাগের কাজ চালিয়ে ধর্মরক্ষা করতেও সমর্থ্য হিন্দু। দীর্ঘ সময় পরাধীনতার নাগপাশে বাঁধা থেকে আজকের দিনে রাষ্ট্রনির্মাণে হিন্দুদের যে বোধ, তার শুভ সূচনা ঘটেছিল শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকে।

'মারাঠা' বলতে বাইরে থেকে যে 'নেশন' বা জনসঙ্ঘ বুঝি, তা আদতে যুগের প্রয়োজনে কয়েকটি জাত বা কাস্ট এক ছাঁচে ঢালা হয়ে অগ্রসর হয়ে যাওয়া একটি 'রাষ্ট্রসঙ্ঘ', যা ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে কখনও সম্ভব হয়নি শিবাজী মহারাজ যে হিন্দু-আধারিত মারাঠা-মিলন গেঁথে তুললেন, বা তার আগেই সেই কাজটি ধীরে ধীরে চলছিল, যা তাঁর সময়ে এবং পরবর্তীকালে তাঁর পুত্রপৌত্রদের রক্তদানে সংহত হয়ে উঠলো, তা এক যুগধর্মের প্রয়াসে ও প্রচেষ্টায়। 'মারাঠা' জাত এবং তার নিকটাত্মীয় 'কুনবী' জাতের অধিকাংশই একদা সৈন্য ও প্রহরীর কাজ করেছে। এই দুই জাতের সমন্বয়েই শিবাজী মহারাজের সেনাদল গড়ে উঠেছিল, যদিও তাঁর সেনাবাহিনীতে সেনাপতি বরণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরাও ছিলেন। এই বিক্রম, এই বীর্য তারা কোথা থেকে পেলেন? পেলেন মহারাষ্ট্রের মতো প্রকৃতিদেবীর হাতে গড়ে তোলা দেশময় গিরিদুর্গের অধিকারী হয়ে। পেলেন সহ্যাদ্রি পর্বতশ্রেণীর পাহাড় বনে ঢাকা দুর্গম অঞ্চলে দীর্ঘদিন নির্জন বাসের ফলে। আত্মরক্ষা করতে এবং আক্রমণকারীকে বাধা দিতে দিতে। খ্রিস্টিয় সপ্তম শতকে চীনা পর্যটক মারাঠা জাতিকে দেখেছিলেন সাহসী, বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী, তেজস্বী ও যুদ্ধপ্রিয় হিসাবে—

ফঃ২

যারা উপকারে কৃতজ্ঞ, কিন্তু অপকারে প্রতিহিংসা নেবার আগে শত্রুকেও শাসিয়ে যায়। এখন আধুনিক মারাঠা জাতের যে শাখায় শিবাজী মহারাজ আবির্ভূত হয়েছিলেন, তারা হলেন 'ভোঁসলে', জমি-চাষ ও পশুপালনই ছিল তাদের জাতিগত ব্যবসা। কিন্তু ষোড়শ শতকের প্রথমে বাহমণী সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার সময় এবং তার একশো বছর পর আহমেদনগরে নিজামশাহি রাজবংশের পতনের সময়ে এই জাতি লাঙ্গল ছেড়ে হাতে তলোয়ার ধরে নিল, শুরু করলো সৈনিকের ব্যবসা, ক্রমশ হয়ে উঠলো জমিদার এবং রাজা, সৈন্যের দলপতি, রাজদরবারে সামন্ত এবং অবশেষে স্বাধীন নরপতি।

নানান সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ; স্বাধীনতার উপাসক, বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় তিনি; কিন্তু রিপুর বশবর্তী ছিলেন না, ছিল উদারতা, সদাচার পরায়ণতা, সাধু সহবাসের আকাঙ্ক্ষা। তাঁর রাজত্বে নারীর মর্যাদা ছিল প্রশ্নাতীত। বিভিন্ন ইতিহাসবিদ তাঁর উপর যে দুর্নাম আরোপ করেছেন তাঁর সঙ্গে বাস্তবতার কোনো যোগ ছিল না বলে প্রমাণ সহযোগে উপস্থাপন করেছেন ১৩০৯ বঙ্গাব্দে 'শিবাজী মহোৎসব' উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণে সখারাম গণেশ দেউস্কর। বিধর্মী ও বিজেতা জাতির দ্বারা বিজিত জাতির ইতিহাস লেখা হলে এমন ভ্রম বিচিত্র নয় বলেই তাঁর অভিমত।

শিবাজীর রাজপতাকা ছিল 'ভাগোয়া ঝাণ্ডা', যা আসলে এক গেরুয়া উত্তরাধিকার। শিবাজীর দীক্ষাগুরু ছিলেন রামদাস স্বামী, যার জন্য সাতারা দুর্গ জয় করার পর সজ্জনগড়ে আশ্রম নির্মাণ করে দিয়েছিলেন শিবাজী মহারাজ (১৬৭৩)। গুরুকে অঢেল ধন আর ঐশ্বর্য দান করলেও তাঁকে দৈনিক ভিক্ষায় যেতে দেখে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। গুরুদেবের সাধ মেটাবেন, পণ করলেন তিনি। রাজ্যের যা কিছু সম্পদ, এমনকী গোটা মহারাষ্ট্র রাজ্যটাই গুরুকে দান করার শপথ নিলেন। এরজন্য যাবতীয় দলিল-দস্তাবেজ প্রস্তুত করলেন তিনি, তৈরি হল দানপত্র। পরদিন সকালে গুরু রামদাস যখন ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বের হবেন, স্বয়ং মারাঠা রাজ তথা হিন্দু-অস্মিতা শিবাজী মহারাজ গুরুর পদতলে সমর্পণ করলেন সমগ্র রাজ্য। গুরু শিষ্যকে বুকে টেনে নিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'তোমার দান আমি গ্রহণ করলাম; এখন থেকে তুমি আমার গোমস্তা হলে। ভোগসুখী ও স্বেচ্ছাচারী রাজা না হয়ে বিশ্বাস করো, তুমি যেন এক জমিদার প্রভুর বিশ্বাসী ভৃত্য হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করছো। এমনই রাজ্যশাসনের দায়িত্বজ্ঞান যেন তোমার থাকে।' ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ মেনে নিলেন হিন্দু যোগীর সর্বাধিনায়কত্ব। সেই থেকে তাঁর রাজ্য পরিণত হলো এক হিন্দু সন্ন্যাসীর ভাবাদর্শে-চালিত রাজ্য, এক যোগী-রাজ্য। রামদাস স্বামীকে রাজ্য দান চিহ্নিত হয়ে থাকলো মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের জাতীয় পতাকা গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত হয়ে। সন্ন্যাসীর গেরুয়া বস্ত্রখণ্ড দিয়েই নির্মিত হলো রাজপতাকা।

রামদাস স্বামী প্রণীত 'দাসবোধ' গ্রন্থটি শিবাজী মহারাজ নিত্যপাঠ করতেন। তাঁর ধর্মানুরাগের প্রাবল্য কখনও হ্রাস পায়নি। তাঁর নিজের মনেও এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, মা ভবানী স্বয়ং স্বরাজ্যস্থাপন ও স্বধর্মরক্ষার জন্য তাঁকে প্রেরণ করেছেন। এই অটল ভগবন্নিষ্ঠা ও বিশ্বাসই তাঁকে 'মারাঠা স্বরাজ্য' প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ করেছে। সমর্থ করেছে মোঘলশাহি, আদিলশাহি ও কুতবশাহির বুকে হিন্দুরাজ্য পতাকা উড্ডীন করতে।

স্বধর্মের দুর্দশা দেখে ব্যথিত রামদাস শিবাজী এবং তাঁর কর্মচারীদের ক্ষাত্রধর্ম সম্পর্কে দীর্ঘ উপদেশ দিয়েছেন। এই উপদেশে শিবাজী জারিত ছিলেন বলেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। গুরু রামদাস বলছেন, 'যিনি মৃত্যুকে ভয় করেন, তাঁহার ক্ষাত্রধর্ম অবলম্বন করা উচিত নহে— অন্য কোনও উপায়ে উদরপূর্তি করা কর্তব্য। যাহারা সমরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তাহাদিগকে ইহলোকে লজ্জা ও অপমান এবং মরণান্তে নরকভোগ করিতে হয়।... কামানের গোলা যেরূপ নির্ভয়ে সৈন্যদলের মধ্যে গিয়া পতিত হয়, প্রকৃত ক্ষত্রিয় সেইরূপ নিঃশঙ্কচিত্তে শত্রুসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করেন। সকলে একোদ্যমে উত্থিত হইলে শত্রুদিগের জন্য আর ভয় কী? ব্যাঘ্র যেরূপ সর্ব-সমক্ষে মৃগযূথকে ধরাশয়ী করে, ঐরূপে উত্থিত হইলে শত্রুদিগকেও সেইরূপে বিনষ্ট করিতে পারা যায়।' এমন গুরুর সামীপ্যে-সান্নিধ্যে থাকার জন্য শিবাজী মহারাজ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন তিনি।

আমরা শিবাজী-রামদাস দ্বৈরথটিকে আধুনিক ভারতে খুঁজে পাই স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ ও ড. শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে হিন্দু জাতি-গঠন-ভাবনার উত্তরাধিকার রচনায়। যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ হিন্দু-জাতি-গঠন সংক্রান্ত নানা ভাষণ ও কাজে বারবার হিন্দু সম্রাট ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্মেলনে হিন্দু রক্ষীদল গঠনের আহ্বান জানান তিনি এবং হিন্দু সমাজের বিপন্নতার বিষয় তুলে ধরেন। কারণ ১৯৩৭ সালের পর থেকে বঙ্গের রাজনীতিতে মুসলমান আধিপত্য বাঙ্গালি হিন্দুজীবনে গভীর সংকট তৈরি করেছিল। নোয়াখালিতেও তার ব্যত্যয় ঘটলো না, গোলাম সারওয়ার ও গোফরানের নেতৃত্বে কৃষক সমিতির অন্তরালে একদল মানুষ হিন্দুদের মধ্যে ক্রমাগত আতঙ্ক সৃষ্টি করছিল; তারপর যা হয়েছিল, ইতিহাস তার সাক্ষী। ১৯৪০ সালের ৭ মে নোয়াখালিতে অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্মেলনে হিন্দু রক্ষীদল কেমন হবে, তা বলতে গিয়ে স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ বললেন, 'ছত্রপতি শিবাজি, শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের জাতি গঠনের পদ্ধতি যেমন ছিল, আমার হিন্দু-জাতি-গঠন-আন্দোলনও সেই ধারায় পরিচালিত।' তাঁর আশীর্বাদধন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যাঁকে 'শিবাজীর কার্যকরীরূপ' বলে বর্ণনা করা হয়, তিনি নোয়াখালির হিন্দুদের দুর্দশাকে এবং তার মোকাবিলাকে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার দিলেন। তিনি এই যাত্রায় দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকারী শিবের রুদ্রমূর্তি সঙ্গে নিয়েছিলেন আর সঙ্গে নিয়েছিলেন বাছাই করা বীরদের। 'আমি কোনো কাপুরুষকে আমার সঙ্গে নেবো না, মাথা দিতে পারে, মাথা নিতে পারে— এমন লোক আমার সঙ্গে চলুক। ত্রিশূল হস্তে আচার্য দেব মঞ্চে সর্বদা সমাসীন থাকতেন, পরিধানে পীতোজ্জ্বল কষায় বসন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মূর্তিতে শিবাজীর পথে হিন্দুজাতি গঠন ও ধর্মরক্ষার বাণী। তাঁর

পরিষ্কার কথা, 'হিন্দু শির দিয়েছে, কিন্তু সার দেয় নাই।' আগের দিন ৬ মে পূর্ববঙ্গের বাবুরহাট সম্মেলনেও বললেন, 'আজ প্রত্যেক হিন্দুকে রাণাপ্রতাপের মতো, ছত্রপতি শিবাজীর মতো, শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের মতো স্বধর্ম ও স্বসমাজের রক্ষার ব্রত ও দায়িত্ব গ্রহণপূর্বক জাতি-গঠন মন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে।' 'বাঙ্গালি হিন্দুর শিরায় শিরায় দুর্জয় বীর্যসঞ্চারের জন্য হৃদয়ে দুর্দম সঙ্কল্প প্রবাহের জন্য ১৩ মে কুমিল্লার হিন্দু সম্মেলনে স্বামীজী আবার শিবাজী-স্মরণ করলেন, 'শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ যে পন্থায় যথাক্রমে মারাঠা ও শিখ জাতিকে মহাজীবন দান করেছিলেন, আমি বাঙ্গলায় সেই সংগঠন-পদ্ধতিক্রমে পরাক্রমশালী হিন্দু-সংহতি গঠনে বদ্ধপরিকর। এই আত্মরক্ষা ও আত্মগঠন প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট প্রবল করে তুলতে পারলে হিন্দুসমাজের যাবতীয় তুচ্ছ ভেদ-বিভেদ ঘৃণা-বিদ্বেষ বিদূরিত হয়ে যাবে।'

এরপর দেখা যায় যুগাচার্য হিন্দুদের পাশে সতত অবস্থান করবার এক প্রবল পরাক্রমশালী হিন্দু নেতার সন্ধানে রত হলেন, যার মধ্যে শিবাজীর মতো অকুতোভয় শক্তি সঞ্চারিত আছে। অবশেষে ১৯৪০ সালের ২৬ আগস্ট জন্মাষ্টমীর দিন আপন মাল্যে বরণ করে নিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে, নিজের সামূহিক-শক্তি সঞ্চারিত করে দিলেন, বাঙ্গালির জন্য এক শিবাজী-প্রতিম নেতা নির্বাচন করে গেলেন। ওই বৎসরই শৈবপীঠ বারাণসীতে দুর্গাষ্টমীর দিন শ্যামাপ্রসাদকে রুদ্ধদ্বারে ডেকে নিয়ে জাগালেন তার মধ্যে থাকা যাবতীয় উদ্যম ও নৈপুণ্য। স্বামী প্রণবানন্দজী-জীবনীকার স্বামী বেদানন্দ 'শ্রীশ্রী যুগাচার্য জীবন চরিত' গ্রন্থে খোলাখুলি লিখেছেন, 'নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে শ্যামাপ্রসাদের প্রচেষ্টা ও সাফল্য মেবারের মহারাণা প্রতাপ অথবা মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শিবাজীর কীর্তির সহিত তুলনীয়।.... আচার্যের আশীর্বাদ শক্তিসমৃদ্ধ-শ্যামাপ্রসাদের অন্তরে সুপ্ত সিংহ গর্জন করিয়া উঠিল। বাঙ্গলার তথা সমগ্র ভারতের নেতাদের বিরুদ্ধে তিনি একক মহাবিক্রমে অভ্যুত্থান করিলেন। পাকিস্তান-রাক্ষসের কবলে সমগ্র বাঙ্গলাকে উৎসর্গ করিবার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গ ছিনাইয়া আনিয়া বাঙ্গালি হিন্দুর দাঁড়াইবার স্থান ও অস্তিত্ব রক্ষার উপায় করিয়া দিলেন।...বাঙ্গলার বীর সন্তান শ্যামাপ্রসাদের জীবন-মাধ্যমে এইরূপে আচার্যের বাংলা ও বাঙ্গালি জাতির রক্ষার সঙ্কল্প রূপায়িত হইয়াছিল।'

স্বামী প্রণবানন্দজীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো 'মহামৃত্যু কী?' (What is Real Death?) তিনি উত্তর দিয়েছিলেন 'আত্ম-বিস্মৃতি' (Forgetfulness of the 'self')। নিজেকে ভুলে যাওয়া, নিজের পূর্ব ইতিহাস ভুলে যাওয়া; নিজের পরিবার, গোষ্ঠী, ধর্মের প্রতি নেমে আসা অসংখ্য আক্রমণের ধারাবাহিকতা ভুলে যাওয়ার নামই হল 'আত্ম-বিস্মৃতি'। বাঙ্গালি হিন্দু হয়ে উঠেছে এক চরম আত্ম-বিস্মৃত জাতি। তারা সহজেই তার উপর নেমে আসা প্রভূত-প্রহার ভুলে যায়; অপরিমিত অন্যায়-অত্যাচার বিস্মৃত হয়। ভুলে যায় বলেই তাদের ক্রমাগত পালিয়ে বাঁচতে হয় 'পূর্ব থেকে পশ্চিমে', আরও পশ্চিমে দৌড় দৌড় দৌড়! জীবন হাতে করে পাশবিক পঙ্কিল পরিবেশে বাঁধা মুক্তির দৌড়! জলছবিটির মতো গ্রাম ছেড়ে অনিশ্চিত জীবনের সন্ধানে নিজের ধর্ম নিয়ে দৌড়! মা-বোন-বউ-মেয়েকে মাংস-হাতড়ানো ভয়ঙ্কর পশুর মুখে ফেলে রেখেই নিজের জীবন বাঁচানোর দৌড়! এই আত্মবিস্মৃতি থেকে বাঙ্গালি তখনই রেহাই পাবে, যখন যাবতীয় জীবনের জিঘাংসার সালতামামি ভুলতে দেবে না! সম্প্রীতির আলিঙ্গন নিয়ে বাস করেও প্রতিবেশীর আক্রমণের হিংসাত্মক ইতিহাস মনে রাখবে! বাঙ্গালি হিন্দু টিকে থাকবে কিনা, তার পরীক্ষা তখনই শুরু হবে।

এখন এই জোর-জবরদস্তির জীবন থেকে মুক্তির পথ কোথায়? পলায়নপর হিন্দু বাঙ্গালির মুক্তি ও শেষ গন্তব্য কোথায়? সে কী তার আপন ধর্ম-সংস্কৃতি বজায় রেখে, সন্তান-সন্ততি নিয়ে নিরুপদ্রবে বেঁচেবর্তে থাকতে পারবে না? পারবে। হিন্দুকে বেঁচে থাকতে হলে সংগঠিত হয়েই থাকতে হবে, প্রায় একশো বছর আগেই বলে গিয়েছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, হিন্দুরক্ষী স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। বলেছিলেন 'সঙ্ঘশক্তি কলিযুগে'। তিনি সঙ্ঘশক্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, কারণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বিশাল জাতিকে এক ধর্মসূত্রে গেঁথে নেবার প্রয়োজন আছে। তিনি হিন্দুকে মহামিলনে সম্মিলিত করাকে সেবা আখ্যা দিয়েছিলেন। হিন্দু বাঙ্গালির সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য উত্তরাধিকার। এই কাজে পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্বজ্জনের অংশগ্রহণ জরুরি, জরুরি ছাত্র ও যুবশক্তির অংশগ্রহণ, মাতৃশক্তির মহাজাগরণ। এরজন্য প্রত্যেকের মানসিক শক্তি চাই। শরীর সবল ও সুস্থ থাকলেই মানুষ মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হতে পারে। মানুষ ভয় পেলে আর শক্তিহীন হলে তোতাপাখির মতো শেখানো বুলি শুনিয়ে যায়। পেশীতে শক্তি না থাকলে সে অমেরুদণ্ডীর মতো আচরণ করে। তখন দু'-চারশো মানুষের জনশক্তিতে ভরপুর গ্রামেও আট দশজন হিংস্র মানুষের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে না। মনে রাখতে হবে, হিন্দু বাঙ্গালির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে এক দুষ্ট শক্তি, তাতে বাইরের দেশের বৃহত্তর মদত আছে। সেই পশুশক্তি প্রতিবেশীর রূপ ধারণ করে আমাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে এবং তারা ঐতিহাসিক কারণেই শক্তিমান। স্বামী প্রণবানন্দজীর মতে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি রক্ষা তখনই সম্ভব হবে, যখন উভয়েই শক্তিশালী ও মত প্রকাশে বলিষ্ঠ হবে। বারে বারে এমনই যোদ্ধা ও সন্ন্যাসীর সহাবস্থানই বোধহয় হিন্দু জাতির পতনকে রোধ করতে সক্ষম হবে। রামদাস-শিবাজীর এই ঐক্যতান অবলোকন করাই হিন্দু সাম্রাজ্যের মূল সুর। এজন্যই আমরা ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর জয়ধ্বনি করি। তাঁর রাজ্যভিষেক দিবস পালন করি।

তথ্যসূত্র :

১. যদুনাথ সরকার (প্রথম সংস্করণ ১৯২৯, ওরিয়েন্ট লংম্যান দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯১), শিবাজী। পৃষ্ঠা: ১-১৭৮

২. সত্যচরণ শাস্ত্রী (জয়শ্রী প্রকাশন ২০১৯) ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর জীবনচরিত। পৃষ্ঠা: ১৭- ৩২০

(লেখক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী)

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক হিন্দুজাতির স্বাভিমানের প্রতীক

অমিত কুমার চৌধুরী

এবছর ২৭ জুন হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব বা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক দিবস। এই দিনে মহারাজা ছত্রপতি শিবাজীকে সমগ্র হিন্দু সমাজ রাজা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিল। উৎসবটি সম্পর্কে হিন্দু সমাজের বেশিরভাগ মানুষ কিছু জানে না বললেই চলে। কিছু ইতিহাসের গবেষক কিছুটা জানেন কিন্তু আবার তাদের কাছে এর বর্তমানে কোনো গুরুত্ব নেই।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একমাত্র সংগঠন যারা তাদের সংগঠনে এই উৎসব পালন করে থাকে। সঙ্ঘ সেই সব উৎসব তাদের শাখায় পালন করে যা দেশপ্রেমের প্রেরণা দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে লোকমান্য তিলক 'শিবাজী উৎসব' প্রচলন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শিবাজী উৎসব' কবিতা লিখেছিলেন। ঠিক সে রকম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার শিবাজী মহারাজের সংগ্রামী নিষ্কলঙ্ক জীবন থেকে প্রেরণা নিয়ে সঙ্ঘের মধ্যে হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব প্রচলন করেন।

১৬৭৪ সালে ৬ জুন মহারাষ্ট্রের রায়গড় দুর্গে জ্যৈষ্ঠ শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক হয়। সেদিন হিন্দু সমাজ শিবাজীকে রাজা হিসেবে মেনে নিয়েছিল। কাশীর পণ্ডিত গাগা ভট্ট তাঁকে 'রাজা' হিসেবে অভিষিক্ত করেন। এই তিথিতেই হতাশাগ্রস্ত হিন্দু সমাজ আত্মমর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিল শিবাজীর দ্বারা হিন্দুপদপাদ শাহী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। হতাশা নিরাশায় নিমজ্জিত হিন্দু সমাজে ক্ষীণ হলেও এক ক্ষুদ্র আলোকবর্তিকা নিয়ে এসে হিন্দুজাতিকে

জাগিয়ে তুলেছিল। সেই সময় হিন্দু সমাজের অবস্থা কেমন ছিল? স্বামীজী বলেছেন, 'বর্বর জাতির আক্রমণ তরঙ্গ বার বার আমাদের এই জাতির মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে । শত শত বৎসর ধরিয়া আল্লা হো আকবর রবে ভারত গগন মুখরিত হইয়াছে এবং এমন হিন্দু কেহ ছিল না, যে প্রতিমুহূর্তে নিজের জীবন বিনাশ আশঙ্কা না করিয়াছে। জগতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ দেশগুলির মধ্যে ভারতীয়রাই সর্বাপেক্ষা বেশি অত্যাচার ও নিগ্রহ সহ্য করিয়াছে।'

স্বামীজীর এই কথা থেকে বোঝা যায় হিন্দুদের কী ভয়ঙ্কর অবস্থা ছিল তখন।

কিন্তু বর্তমানেও কি হিন্দুরা খুব ভালো আছে। এক নেত্রী শিবলিঙ্গকে অপমান করে হিন্দু ধর্মকে উপহাস করেন। এক প্রগতিশীল কবি মহাদেবের ত্রিশূলে আপত্তিকর বস্তু পরিয়ে মজা পান। এক উচ্চশিক্ষিতা দাম্ভিক নেত্রী মা কালীকে 'মাংস খেকো' বলে উপহাস করেন। তামিলনাড়ুর এক নেতা সনাতন ধর্মের সমূলে ধ্বংস চান। মুর্শিদাবাদের এক নেতা হুমকি দেন হিন্দুদের দু'ঘণ্টার মধ্যে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেবার। দেশের বহু অঞ্চলে হিন্দুদের ধর্মাচরণে বাধা দেওয়া হয়। কাশ্মীর উপত্যকা হিন্দু শূন্য করা হয়েছিল। কাশ্মীর উপত্যকায় আগে পাঁচ লক্ষ হিন্দুর বাস ছিল। এখনো শ্রীনগর শহরে একটি হিন্দু মন্দির দখল করে আছে এক মুসলমান। মন্দিরে কোনো হিন্দু পুরোহিত নেই। হিন্দুরা নিজেরাই পূজা দিয়ে প্রণামী দেয়। হিন্দু শোভাযাত্রায় ইট পাথর ছোড়া হয় আজও এই হিন্দু প্রধান ভারতে। আর বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে এ জাতীয় ঘটনা অহরহ ঘটছে।

শিবাজীর আগে মৌর্য যুগ, গুপ্ত যুগ ভারতের ইতিহাসে এক স্বর্ণময় যুগ ছিল। শক, হুন, গ্রিকদের হিন্দু বীর রাজারা পরাস্ত করে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিল। এমনকী তাদের হিন্দু সমাজের মধ্যে একীভূত করে নিতে সক্ষম হয়েছিল হিন্দু সমাজ, কারণ সমাজ তখন শক্তিশালী ছিল। তারাও ভারতীয় উদার জীবনধারার কালের গতিতে সম্পূর্ণ মিশে গিয়েছিল। তাই হিন্দু সাম্রাজ্য ঘোষণার কোনো প্রয়োজন হয়নি।

কিন্তু ইসলামি শাসনে বহিরাগত মুসলমানেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে যে নৃশংসতা ও অস্ত্রের ঝংকারে হিন্দু জীবনচর্যা ও জীবনপদ্ধতি বিধ্বস্ত করার নির্মম চেষ্টা করছিল তখনই নিজের দেশ, জাতি, সমাজ, ধর্ম ,সংস্কৃতি রক্ষাকল্পে হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। বর্বর ইসলামি শাসনে হিন্দুর দেবালয়, মন্দির ধ্বংস হচ্ছে, মূল্যবান জ্ঞানভাণ্ডার গ্রন্থাগার হচ্ছে ভস্মীভূত, অত্যাচারিত হচ্ছে মাতৃজাতি, হাজার হাজার রাজপুত রমণী জহরব্রত করে নিজের সতীত্ব রক্ষায় জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিচ্ছেন। অসম্মানজনক জিজিয়া কর দিয়ে হিন্দু সেদিন হীন হয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে। কিছু শ্রেষ্ঠ বীর যোদ্ধা মুঘলদের অধীনতা স্বীকার করে সাধারণ এক সেনাপতির দায়িত্ব পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করছে। এহেন চরম সংকটকালে ঐতিহাসিক কারণেই হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের হিন্দবী স্বরাজের ঘোষণা সেই সময় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। অত্যন্ত নিরাশাজনক পরিস্থিতিতে হিন্দু সমাজ যখন নিষ্ঠুর আওরঙ্গজেবের অত্যাচারে ভীত, সন্ত্রস্ত, কম্পিত, তটস্থ, নির্যাতিত, নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত, শিবাজী মহারাজ তখন দেশবাসীকে স্বদেশ, স্বধর্ম, স্বতন্ত্র রক্ষার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে ইসলামি শাসনের অবসানের আহ্বান জানান। হিন্দু পদপাদশাহীর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে মহারাষ্ট্রের রায়গড় দুর্গে জ্যৈষ্ঠ শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে তাঁর রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন যে বিদেশি বর্বর আক্রমণকে সফলভাবে পরাস্ত করে হিন্দু অস্মিতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব।

ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার শিবাজী সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি শিবাজীকে শেষ মহান গঠনমূলক প্রতিভা এবং জাতি নির্মাতা হিসেবে বিবেচনা করি যা হিন্দু জাতি তৈরি করেছে। শিবাজী আধুনিক হিন্দুদের পূর্ণ মর্যাদায় বাঁচতে শিখিয়েছিলেন।'

সেই রাজ্যভিষেকের কারণে তৎকালীন অন্যান্য রাজাদের তো সঙ্গে শিবাজীর গুরুত্ব উচ্চকণ্ঠে স্বীকৃত হলো।

কৌটিল্য প্রমুখ ভারতীয় রাজনীতিবিশারদদের মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে আদর্শ রাজ্য গঠন সম্ভব এবং ভারতীয় শাস্ত্র আধারিত অষ্টাপ্রধান শাসন পদ্ধতি বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন করলেন। গুরু সমর্থ স্বামী রামদাসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি রাজর্ষির মতো প্রজাবৎসল এক কল্যাণকারী রাজ্য স্থাপন করলেন। শায়েস্তা খাঁ, আফজাল খাঁকে সমুচিত শাস্তি দিলেন। আবার হিন্দু চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্ত্রীলোক, মসজিদ ও কোরানের কোনো অসম্মান করলেন না। তাই চরম হিন্দুবিদ্বেষী ঐতিহাসিক কাফি খাঁও শিবাজীর এই কাজকে সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হন। তাই এই হিন্দুসাম্রাজ্য দিনোৎসব হিন্দুর অস্মিতা ও বীরত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয় যার প্রাসঙ্গিকতা আজও সমান। তাই বর্তমান ভারতের হিন্দু সমাজের মধ্যে হিন্দুত্বের ভাবনা জাগিয়ে তুলে ভারতকে শক্তিশালী করে তোলা প্রতিটি হিন্দুর কর্তব্য। স্বামী বিবেকানন্দ শিবাজী মহারাজকে জাতির নির্মাতা বলেছেন। ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার শিবাজী সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি শিবাজীকে শেষ মহান গঠনমূলক প্রতিভা এবং জাতি নির্মাতা হিসেবে বিবেচনা করি যা হিন্দু জাতি তৈরি করেছে। শিবাজী আধুনিক হিন্দুদের পূর্ণ মর্যাদায় বাঁচতে শিখিয়েছিলেন।' আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শিবাজী উৎসব কবিতায় বলেছেন— ''মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙ্গালি,এক কণ্ঠে বলো 'জয়তু শিবাজী'।

মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙ্গালি,এক সঙ্গে চলো মহোৎসবে সাজি।' □

স্বরাজ্য সৈনিকের আত্মবলিদানে ঘোরখেণ্ড আজ পাবনখেণ্ডে পরিণত

সারদা প্রসাদ পাল

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ প্রসঙ্গ আলোচনাক্রমে আজ এই নিবন্ধের অবতারণা। ব্রিটিশদের পরাধীনতায় থাকতে থাকতে তাদের আদব কায়দায় যেমন আমাদের ইতিহাস বিকৃত হয়েছে, সেইরকম তাদের দ্বারা চাপানো অনেক প্রথায় দেশবাসী বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আমাদের নিজস্বতাকে ভুলে গিয়ে তাদেরটাই গ্রহণ করেছি। যেমন জন্মদিনে প্রদীপ না জ্বালিয়ে মোমবাতি নেভানো, নমস্কারের পরিবর্তে হ্যান্ডসেক ইত্যাদি।

আমরা ম্যারাথন দৌড়ের নাম শুনেছি। কিন্তু এই ম্যারাথনের সঙ্গে আমাদের বা আমাদের দেশের কোনো সম্পর্ক নেই। আজ থেকে ৪৯০ খ্রিস্টপূর্বে গ্রিসে গ্রিকদের সঙ্গে পারসিকদের ম্যারাথন নামক স্থানে যুদ্ধ হয়েছিল। গ্রিকরা যুদ্ধে জয়লাভের পর এক বার্তাবাহক সেই জয়বার্তা পৌঁছাতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রায় ২৬ মাইল (৪২ কিলোমিটার) পথ দৌড়ে এথেন্স শহরে যায়। ম্যারাথন থেকে এথেন্সের দূরত্ব প্রায় ৪১.১০ কিলোমিটার। সেই বার্তাবাহক সৈনিকটি দৌড়ের ধকল সহ্য করতে না পেরে হার্টফেল করে মারা যায়। এই ঘটনার স্মৃতি হিসেবে তার স্মরণে, এই কিংবদন্তী দৌড়বিদের স্মৃতি ও আত্মত্যাগকে সম্মান জানাতে ১৮৯৬ সালে এথেন্সে অনুষ্ঠিত প্রথম আধুনিক অলিম্পিক গেমসে প্রথম ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়। ব্রিটিশরা ম্যারাথন দৌড় নামে একটি খেলা চালু করে। যখন ওই ঘটনা ঘটেছিল তখন পৃথিবীতে ইংরেজ বলে কোনো জাতি ছিল না। ভারতবর্ষে প্রথম আক্রমণকারী ছিল সেই গ্রিসের রাজা আলেকজান্ডার ৩২৭ খ্রিস্টপূর্বে। সেই দেশের সঙ্গে জড়িত একটা খেলা ভারতে চালু হয়ে গেল।

ভারতেও ম্যারাথন দৌড় নামে খেলা শুরু হয়েছে। অনেক ইতিহাস গবেষক জানেন না, আমাদের দেশে এরকম কোনো ঘটনা ঘটেছিল কিনা। আমাদের দেশে শিবাজী মহারাজ ছিলেন। তিনি আফজল খাঁকে যখন কৌশলে নিজের জায়গায় নিয়ে এসে হত্যা করলেন, তখন আদিল শাহ শিবাজী মহারাজকে ধরার জন্য সিদ্দি জৌহর নামে এক পাঠানকে ৪০ হাজার সৈন্য দিয়ে পাঠিয়েছিল। শিবাজী মহারাজ তখন পানহালগড় দুর্গে ছিলেন। সিদ্দি জৌহর ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে দুর্গ অবরুদ্ধ করে বসে রইল। দুর্গ অনেক মজবুত ছিল। কিন্তু কেউ বাইরে যেতে পারছে না বা ভেতরেও আসতে পারছে না। এই অবস্থায় দিন যায়, মাস যায়। প্রায় দু'মাস অতিক্রান্ত। দুর্গের মধ্যে যখন রসদে টান পড়েছে, তখন শিবাজী মহারাজ ওখান থেকে সরে পড়ার মতো রাস্তা খুঁজতে থাকলেন। এই সময় তাঁর সহচরদের মধ্যে একজন খোঁজ দিলেন যে সেই দুর্গের পিছনে পাথর, কাঁটাঝোপে ভরা দুর্গম একটি গোপন রাস্তা আছে, সেখান দিয়ে পালিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

সাধারণত কোনো মানুষ ওই রাস্তা ব্যবহার করতে পারে না বলেই ওটা ছেড়ে রাখা হয়েছিল। শিবাজী ঠিক করলেন যে এ রাস্তা দিয়েই যাবেন। একটা পরিকল্পনা করলেন। তাঁর একজন নাপিত ছিল। তার নাম শিবা। তাঁকে ডেকে পাঠালেন। ডাক পেয়ে তিনি ভয়ে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে এসে হাজির হলো। শিবাজী তাকে কাছে ডেকে বললেন, শিবা আমার জন্য একটা কাজ করতে হবে। শিবা শুনে বলল— মহারাজ, আমিতো চুল-দাড়ি কাটা ছাড়া আর তো কিছু পারি না, আপনার তরবারিও বইতে পারব না। শুনে শিবাজী বললেন, তোমাকে কিছু করতে হবে না শুধু নকল শিবাজী সাজতে হবে।

---আমি শিবাজী সাজব? এতো সৌভাগ্যের কথা। বলুন মহারাজ কবে সাজতে হবে?

শিবাজী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে শিবা নাপিতের পিঠে পড়তে সে চমকে উঠল। বলল— মহারাজ, আপনার চোখে জল?

শিবাজী বললেন—শিবা, তুমি কি জানো এর পরিণতি কী হবে? সে বলল হ্যাঁ মহারাজ, জানি। আমার এই মুণ্ডুটা হয়তো সিদ্দি জৌহর কেটে ফেলবে। কিন্তু আমার মতো সাধারণ একজন মানুষ দেশের জন্য প্রাণ দিতে তো পারব। আপনার দেওয়া একটা কাজ আমাকে যে সম্মান দেবে সেটাই আমার জীবনকে ধন্য করবে।

শিবাজী মহারাজ বললেন, শিবা, তোমার পরিবার আছে, তোমার ছেলে-মেয়ে আছে তুমি চলে গেলে তারা অনাথ হয়ে যাবে।

শিবা বলল, মহারাজ, আপনার যারা সৈনিক তাদেরও তো পরিবার আছে, তারা

কি পরিবারের কথা চিন্তা করে এসেছে। আপনি কি আপনার পরিবারের কথা চিন্তা করছেন? আমি জীবনে কোনোদিন সৈনিক হতে পারব না, যুদ্ধ করতে পারব না কিন্তু নকল হলেও 'শিবাজী' হয়ে মরতে পারব এটা কি কম সৌভাগ্যের কথা!

ঠিক হলো পানহাল দুর্গ থেকে দুটি পালকি বেরোবে। একটায় আসল শিবাজী, অন্যটায় নকল শিবাজী শিবা নাপিত।

যাত্রা শুরু হলো। কিছুটা রাস্তা যাওয়ার পরেই দ্বিতীয় পালকিটা ধরা পড়ল। নকল শিবাজীকে সিদ্দি জৌহরের কাছে নিয়ে আসা হলো। সিদ্দি যখন জিজ্ঞাসা করল— তুমি কে?

—আমি শিবাজী। সিদ্দি জৌহর ভাবলে যাকে শায়েস্তা খাঁ, আফজল খাঁ মারতে পারেনি, তাকে আমি জ্যান্ত ধরে ফেললাম। তখন একজন সৈনিক বলল, সুলতান দু'টি পালকি বেরিয়েছে। তখন শিবাকে জিজ্ঞাসা করা হলো ওই পালকিতে কে আছে?

—শিবাজী মহারাজ।

—তাহলে তুমি কে?

—আমিও শিবাজী।

সিদ্দি জৌহর চিৎকার করে ওঠে, তাহলে তুমি কে? শিবা শান্ত স্বাভাবিক ভাবে বলে আমি শিবাজী। রাগ সামলাতে না পেরে সিদ্দি জৌহর শিবা নাপিতের বুকে তরবারি বসিয়ে দিল। ধীরে ধীরে শিবা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। এবার শিবাজীকে ধরার জন্য দলে দলে পাঠান সেনাকে পাঠানো হলো।

শিবাজী মহারাজ ততক্ষণে ৪০ কিলোমিটার রাস্তা পার হয়ে গেছেন। বিশালগড় পৌঁছতে আর ১২ কিলোমিটার বাকি। এরা পদব্রজে যাচ্ছে আর শত্রু সৈন্য ছুটে আসছে ঘোড়ায় চড়ে।

কিছুটা দূরে শিবাজী মহারাজের পালকি একটা স্থানে এসে পৌঁছলো। জায়গাটির নাম ঘোরখেণ্ড। তখন জানা গেল যে শত্রুসৈন্য আর মাত্র ৩ কিলোমিটার দূরে। শিবাজী মহারাজ বললেন, এখানেই যুদ্ধ করব। তখন সেনাপতি বাজীপ্রভু দেশপাণ্ডে বললেন, না মহারাজ আপনার বেঁচে থাকা প্রয়োজন। আমি শত্রুসৈন্যের পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকব। আপনি বিশালগড়ে পৌঁছে তোপ না দাগা অবধি যুদ্ধ চালিয়ে যাব। একজন বাজীপ্রভু মারা গেলে অনেক বাজীপ্রভু পাওয়া যাবে। কিন্তু শিবাজী মহারাজ একটাই হয়। এটাও শিবাজী মহারাজের পরীক্ষা। শিবা নাপিতকে বলিদান দিয়েছেন, এখন বাজীপ্রভুকে দিতে হবে। তাছাড়া ৪০ হাজার পাঠান সেনার সামনে ৩০০ সৈন্যের যুদ্ধ করার অর্থ সিংহের মুখে খরগোশকে রাখার মতো। যখন প্রত্যয় দৃঢ় থাকে তখন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই হয়। বাজীপ্রভুকে বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুসজল কণ্ঠে শিবাজী মহারাজ বললেন, কথা দিন তোপের শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে আপনি সবকিছু ছেড়ে আমার কাছে চলে আসবেন।

শিবাজী মহারাজ রওনা হওয়ার পর বাজীপ্রভু সৈন্যসজ্জা করতে লাগলেন। ৫০ জন সৈন্য সামনে থেকে যুদ্ধ করবে। বাকিরা পেছনে থাকবে। যারা আহত হবে তাদের পেছনে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা করা হবে। অন্য দল এসে শত্রুসৈন্যের মোকাবিলা করবে। সৈন্যদের অবস্থা কেমন? ৪০ কিলোমিটার দৌড়ে এসেছে দুর্গম পাহাড়ি রাস্তায়, ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরছে, দাঁড়িয়ে থাকাই দায়, তার উপর বিশ্রাম নেই।

ইতিমধ্যে শত্রুসৈন্য হাজির, যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। যুদ্ধ করতে করতে বাজীপ্রভু জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। তখন তাঁকে পেছনে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করা হলো। জ্ঞান ফিরলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোপের শব্দ শোনা গেছে কিনা। উত্তর না পেয়ে বীর বিক্রমে আবার যুদ্ধ শুরু করলেন। কেননা শত্রু সৈন্যদের এগোতে দেওয়া যাবে না। বাজীপ্রভুর সৈন্যরা যুদ্ধ করছে কিন্তু কানটা পড়ে রয়েছে তোপের শব্দের দিকে।

এক্ষেত্রে এমন কোনো সৈন্য ছিল না যার দেহে ৫০-এর বেশি আঘাত লাগেনি। বাজীপ্রভুর সারা শরীর রক্তাক্ত। মনে হচ্ছে যেন একটি রক্তপিণ্ড। কিন্তু যুদ্ধ থামাননি, আত্মসমর্পণ করেননি। সেদিন প্রায় ৭ ঘণ্টা ধরে সিদ্দি জৌহরের ৪০ হাজার সৈন্যকে আটকে রেখেছিল মাত্র ৩০০ সেনা। ৭ ঘণ্টা বাদে বহু প্রতীক্ষিত তোপের সমধুর শব্দ শোনা গেলে বাজীপ্রভু প্রাণত্যাগ করলেন। কিন্তু এই ৫২ কিলোমিটার রাস্তা ৭ ঘণ্টা লাগল কেন? যখন ৩০০ সৈনিক নিয়ে শিবাজী মহারাজ বিশালগড়ের দিকে যাচ্ছিলেন, পথে দুই রাজপুতরাজা সূর্যরাও এবং যশবন্তরাও শিবাজী মহারাজের রাস্তা অতিক্রম করতে আটকে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এত দেরি হলো।

শিবাজী মহারাজ বিশালগড়ে পৌঁছতেই তোপ দাগা হলো যাতে বাজীপ্রভু চলে আসতে পারেন। শিবাজী মহারাজের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল বাজীপ্রভুকে আলিঙ্গন করার আর বাজীপ্রভুর ইচ্ছা ছিল তোপের শব্দ শোনার। কিন্তু বাজীপ্রভু শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ত্যাগ করলেন। সমস্ত সৈনিকের রক্তে রঞ্জিত ওই ঘোরকেণ্ডের মাটি পবিত্র হয়ে পরিণত হলো পুণ্যখেণ্ড। ভক্তিভাব নিয়ে ওখানকার কোনো পাথর তুলে কানে ধরা হয়, এখনো 'হর হর মহাদেব' শব্দ শোনা যায়। ওখানকার মাটি নিয়ে জলে মেশালে আজও বাজীপ্রভুর সৈনিকদের রক্তের মতো লাল হয়ে যায়। এরা ৫২ কিলোমিটার দৌড়েছিল, ম্যারাথনের সেই বার্তাবাহক সৈনিক ৪০ কিলোমিটার দৌড়েছিল। এদের হাতে ছিল ৫টি তলোয়ার-সহ ১০টি ভারী ভারী বল্লম; এদের অতিক্রম করতে হয়েছিল কণ্টকাকীর্ণ পথ, অন্ধকার রাত্রি। আর সেই বার্তাবাহক গ্রিক সৈন্য দিনেরবেলায় সুগম রাস্তায় খালি হাতে দৌড়েছিল। সেই সৈনিকটি হার্টফেল করে মারা গেল, কিন্তু শিবাজী মহারাজের ৩০০ সৈনিক লড়াই করতে করতে মৃত্যুবরণ করেছিল। এরা জীবন উৎসর্গ করেছিল।

গ্রিসের বার্তাবাহক সেই সৈনিকের দৌড়ের কোনো নথি বা প্রমাণ নেই। কিন্তু শিবাজী মহারাজের সৈন্যদের জীবন উৎসর্গের প্রমাণ রয়েছে, ইতিহাসের নথি রয়েছে। ভাবতে হবে আমাদের কাছে গর্বের বিষয় ম্যারাথন না পাবনখেণ্ড? আমাদের দৌড়ের নাম 'পাবনখেণ্ড' রাখা উচিত। এটি ভারতবাসীর স্বাভিমান ও গর্বের বিষয়। এখন থেকে ম্যারাথন নাম বন্ধ করে পাবনখেণ্ড খেলা শুরু করতে হবে। এই নামের মধ্যে দেশের জন্য আত্মত্যাগের জ্বলন্ত ইতিহাস আছে। □

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ২৬ জুন

শালিহোত্র

হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব (২৬ জুন, ২০২৬) :

দীর্ঘ ৬৭৫ বছর (৯৯৯-১৬৭৪ খ্রি:) ধরে একের পর এক আগ্রাসী বিদেশি ইসলামি শাসনের পরাধীনতা ও আত্মবিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে হিন্দু জাতি তথা ভারতবর্ষকে আবার স্বাধীনতার আলো দেখাতে এবং আত্মশক্তির পুনঃস্থাপনে উদ্বোধিত করতে ভারতবর্ষের পশ্চিমতটে মহারাষ্ট্র প্রদেশে যে বীর আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি হিন্দুকুলগৌরব ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ। ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশীতে রায়গড় দুর্গে তাঁর রাজ্যাভিষেকের দিনটি হিন্দু সমাজের কাছে একটি বিশেষ শুভদিন। এই দিনটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'হিন্দু সাম্রাজ্য দিবস' রূপে প্রতিষ্ঠিত, যে দিনটি মুঘল-পরাধীন ভারতবর্ষে হিন্দু জনমানসে স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিয়েছিল, ঘোষিত হয়েছিল মুসলমান শাসনের নাগপাশ থেকে ভারতবর্ষের আপামর হিন্দুর বহু প্রতীক্ষিত মুক্তির দিন, ফিরে এসেছিল হিন্দু স্বাভিমান! এবছর ২৬ জুন, ২০২৬ হচ্ছে সেই গর্বের 'হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব' উদ্‌যাপনের দিন।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৮তম জন্ম বার্ষিকী (২৬ জুন, ২০২৬)। প্রায় একই রকম ইতিহাসের আবর্তে, ব্রিটিশ শাসনের পরাধীন ভারতবর্ষে ২৬ জুন, ১৮৩৮ সালে জন্ম নিয়েছিলেন যে মহাপুরুষ, তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তার উদ্বোধনে এক অপরিসীম আলোকোজ্জ্বল দায়িত্ব পালন করেছিলেন— তিনি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৫১ বছর আগে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বাধিক অনুপ্রেরণা জোগানো, ১৮৭৫ সালে তাঁর রচিত 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি মহা শক্তিশালী নির্ঘোষ তথা প্রেরণাদায়ী সঙ্গীত হিসেবে মুখরিত হয়ে উঠেছিল শুধু নয়, তা ব্রিটিশ শাসনের ভিত নড়িয়ে দিয়ে তাকে উৎপাটিত করার অনুঘটকের কাজটিও করেছিল!

ভারতীয় গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধী 'জরুরি অবস্থা'র ৫১তম বার্ষিকী (২৬ জুন, ২০২৬)। 'বন্দে মাতরম্' উদ্‌ঘোষিত হওয়ার ঠিক একশো বছর পরে, এই ২৬ জুন, ১৯৭৫ সালের ভোরে আসমুদ্র হিমাচলে এসেছিল এমন এক সকাল যা রাতের চেয়েও অন্ধকার! দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতীয় গণতন্ত্র হত্যার একটি সরকারি দানবীয় সিদ্ধান্তের বার্তা— 'জরুরি অবস্থা'! অগণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সুপারিশে ভারতের রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ ২৫ জুন, ১৯৭৫ সালে জারি করেন গণতন্ত্র হত্যাকারী এই কালা কানুন যা কার্যকর ছিল ২১ মার্চ, ১৯৭৭ অবধি। নির্বাচন বাতিল করা, নাগরিক অধিকার হরণ করা শুধু নয়, অধিকাংশ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে কারারুদ্ধ করে তাঁদের উপর নানাবিধ নির্যাতন চালানো হয়। নিয়ন্ত্রণ করা হয় গণমাধ্যমগুলিকে, লক্ষাধিক রাজনৈতিক বিরোধী সাংবাদিক ও ভিন্নমতাবলম্বীকে আটক করা শুধু নয়, বিরোধীশূন্য সংসদে একাধিক সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। এই সব অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জনমত সুসংহত ও সংগঠিত করে সারা দেশ ব্যাপী গণতন্ত্রকামী জনগণের মধ্যে এক ব্যাপক জনজাগরণ ও আন্দোলনের মাধ্যমে অবশেষে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে সেই স্বৈরাচারী ইন্দিরা সরকারের পতন ঘটানো হয়।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বিশেষ অনুভূতিতে বলা যায় যে ভারতমাতা আবহমানকাল ধরে তাঁর অতুল ঐশ্বর্য ও ভালোবাসা দিয়ে সবাইকে গ্রহণ করে নিজের কোলে স্থান দিলেও বারবার বিদেশি হানাদারেরা চেষ্টা করে গেছে এই পুণ্যভূমিকে লুণ্ঠন করে অসম্মান করতে, হিন্দুত্ব তথা রাষ্ট্রীয় জীবনবোধকে আহত করতে, কিন্তু যুগে যুগে বিভিন্ন মহাপুরুষ এই দেশমাতৃকার কোলে জন্ম নিয়েছেন যাঁদের প্রয়াসে পরাধীনতার শৃঙ্খল বার বার ভেঙে মাতৃভূমি আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁদের দুর্মর প্রভাব ও প্রেরণায় বিবিধ প্রসাশনিক নিষ্পেষণ, ধর্মীয় নিষ্পেষণকে সমূলে বিনষ্ট করে আবার স্বাজাত্যভিমানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হিন্দুরাষ্ট্রের হৃতগৌরব। হিন্দু গৌরব তথা দেশ গৌরব প্রতিষ্ঠায় ছত্রপতি শিবাজীর ভূমিকা থেকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি তারই সাক্ষ্য বহন করে। ভারতীয় হিন্দু জনগণ যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশ হিতার্থে কোনো সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ নেয় তা যে কত ব্যাপক ও সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারে তার নিদর্শন ১৯৭৭ সালে 'জরুরি অবস্থা' আরোপকারী স্বৈরাচারী ইন্দিরা শাসনের অবলুপ্তি কিংবা পশ্চিমবঙ্গের সদ্য নির্বাচনে অত্যাচারী হিন্দু বিরোধী তথা দেশ বিরোধী শক্তিকে পর্যুদস্ত করে রাষ্ট্রবাদী সরকারের প্রতিষ্ঠা যা প্রকৃত অর্থে ১২০৬ সালে বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণ সেনের ৮২০ বছর পর, 'বন্দে মাতরম্' এর উদ্গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মাটিতে স্বাধীনতার পর এই প্রথম হিন্দুত্বের সরকারের প্রতিষ্ঠা।

ভারতীয় হিন্দু জনগণ যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশ হিতার্থে কোনো সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ নেয় তা যে কত ব্যাপক ও সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারে তার নিদর্শন ১৯৭৭ সালে 'জরুরি অবস্থা' আরোপকারী স্বৈরাচারী ইন্দিরা শাসনের অবলুপ্তি কিংবা পশ্চিমবঙ্গের সদ্য নির্বাচনে অত্যাচারী হিন্দু বিরোধী তথা দেশ বিরোধী শক্তিকে পর্যুদস্ত করে রাষ্ট্রবাদী সরকারের প্রতিষ্ঠা।

ভারতমাতার আঁতুড়ঘর আজ অস্তিত্ব সংকটে

১৯০৫ সালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুলিতে আঁকা 'ভারতমাতা' শুধু একটি চিত্রকর্ম নয়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অমর সাংস্কৃতিক প্রতীক। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল সময়ে আঁকা এই চিত্রে ভারতকে চতুর্ভুজা, গৈরিক বস্ত্রপরিহিতা, জ্ঞান, অন্ন, বস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতার প্রতীক এক মাতৃরূপে কল্পনা করা হয়েছিল। এই ছবিই লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মনে জাতীয় চেতনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত বেদনাদায়ক সত্য হলো, যে ঐতিহ্যবাহী গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট থেকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতীয় চিত্রধারার বিকাশ ঘটেছিল, আজ সেই ১৭২ বছরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান নিজেই অস্তিত্ব সংকটে।

অবনীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় শৈলীর চিত্রকলার বিভাগ ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে। যে কলেজে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এসেছিলেন ছবি আঁকতে, সেই কলেজের পরিকাঠামো আজ চরম অবহেলার শিকার। জীর্ণ ভবন, অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং দীর্ঘদিনের অযত্নে পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের শিল্পশিক্ষার এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান যেন ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

একদিকে আমরা ভারতমাতার ছবি নিয়ে গর্ব করি, অন্যদিকে সেই ভারতমাতার চিত্র সৃষ্টিকারী শিল্প-ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠানকে হারিয়ে যেতে দিই। এটি শুধু একটি কলেজের সংকট নয়; এটি পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং জাতীয় আত্মপরিচয়ের সংকট। আজ সময় এসেছে সরকার, শিল্পীসমাজ, প্রাক্তনী ও সচেতন নাগরিকদের একসঙ্গে এগিয়ে আসার। কারণ গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফটকে বাঁচানো মানে শুধু একটি কলেজকে বাঁচানো নয়— ভারতমাতাচিত্রের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে রক্ষা করা।

—**সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়,**
কোন্নগর, হুগলী।

কলকাতা চর্মনগরীর বেহাল দশা

বানতলার চর্মনগরী কলকাতা থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে বাসন্তী হাইওয়ের ওপর অবস্থিত। রপ্তানি নির্ভর এই আর্থিক জোন নয়টি বিভাগে বিভক্ত। এই নয়টি বিভাগে ট্যানারি শিল্প ছাড়া লেদার গুডস ইউনিট রয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দশ লক্ষ লোকের জীবিকা জড়িয়ে রয়েছে এই আর্থিক জোনের ওপর। একসময় এই পুরো ট্যানারি শিল্পের অবস্থান ছিল বেলেঘাটার ক্যানাল সাউথ রোড, ধাপা, ট্যাংরা, তপসিয়া ও পার্ক সার্কাস স্টেশন সংলগ্ন চার নম্বর রেল সেতুর আশেপাশে ছড়িয়ে ছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ২০০৫ সালে বামফ্রন্টের সময়ে দূষণের জন্য পুরো শিল্প স্থানান্তরিত হয় কড়াই ডাঙ্গার মৌজার এই অঞ্চলে। দূষণ নিয়ন্ত্রণে সমস্ত ব্যবস্থা পরিকল্পনার অভাবে বানচাল হয়ে যাওয়ার প্রায় সাড়ে তিনশো ট্যানারির যাবতীয় বর্জ্য জল নয়টি জোনে প্রায় এগারো শো একর জমিকে প্লাবিত করে স্থানীয় মানুষের জীবনকে করে তুলেছে দুর্বিষহ। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে পণ্যবাহী কোনো যান-সহ বাইক, প্রাইভেট গাড়ি-সহ সাধারণ মানুষের যাতায়াতের মোটরচালিত ভ্যানও যাতায়াত করতে পারে না। বর্ষা আসন্ন। বর্ষার আগে যদি এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হয় তবে বর্ষায় অবস্থা কী হতে পারে সহজেই অনুমেয়। পশ্চিমবঙ্গে নতুন বিজেপি সরকার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যখন নতুন শিল্প গড়তে আগ্রহী, তখন শতাব্দী প্রাচীন এই রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অঞ্চলের পরিকাঠামোর উন্নয়নের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—**তারক সাহা,**
হিন্দমোটর, হুগলী।

তৃণমূলের ভাঙন সময়ের অপেক্ষায় ছিল

বিজেপি যদি তৃণমূলিদের রাজনৈতিক সন্ন্যাসে না পাঠাতে পারে, পরে বিপদে পড়তে হতে পারে। আমার অনুমান, দল ভাঙার পিছনে সুবিধাবাদী মাকুদের বিশাল উদ্দেশ্য থাকতে পারে! এরপর মিনিমাম দাবি উঠবে সংখ্যালঘু মন্ত্রী চাই! মন্ত্রী মানেই সরকারের মূল প্ল্যান ও খবরগুলো পেয়ে যাবে। আমি ভোটের আগেই বা ফল বের হবার দিন লিখেছিলাম— তৃণমূলের হিন্দু জনপ্রতিনিধিদের বেশিরভাগ আলাদা হয়ে নতুন দল করবে এবং পরে বিজেপিতে আসবে। তেমনি মুসলমানরা আলাদা হয়ে এআইএসএফ বা হুমায়ুন বা কংগ্রেস বা সিপিআইএম-এ যোগদান করবে। সেটা করলে ভয় পেতাম না বরং খুশি হতাম। কিন্তু তারা বিজেপিতে ঢুকছে সেটাই বড়ো ভয়। বিজেপির লক্ষ্য থাকতে পারে বিভিন্ন আইন পাশ করার জন্য ৬৬ শতাংশের সমর্থন লাভ। দেখা যাক, কীভাবে এদের সামলায়। তৃণমূলি মানেই তো সুবিধাবাদী।

—**মৃণাল মজুমদার,**
বার্লিন, জার্মানি।

সন্ত্রাসমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ

২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনের পর বাংলাদেশ নিয়ে ভারত সরকারের নীতি পরিবর্তন খুব জরুরি বলেই মনে হয়। বিগত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে ক্রমাগত হিন্দুদের উপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার চলছে তার স্থায়ী সমাধান করতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিন্দুদের রক্ষার্থে যৌথভাবে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। সেই সঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক করে ১৯৭১ সালের মতো আবার একটা কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় হয়েছে। ১৯৭১ সালে ভারত সরকারের নীতির কারণে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম

ফ ঃ ৩

হয়েছিল। ১৯৫০ সালের পর থেকে যে সমস্ত মুসলমান ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে তাদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে ফেরত পাঠাতে হবে। অন্যদিকে বাংলাদেশের হিন্দুদের রক্ষার্থে বাংলাদেশে হিন্দু হোমল্যান্ড বানিয়ে দেওয়ার বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বারে বারে আক্রমণ হবে আর লক্ষ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসবে, এটা বন্ধ হওয়া দরকার। বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা বিতাড়িত হয়ে ভারতে আসছে, আর তাদের ফেলে আসা সম্পত্তি মুসলমানরা ভোগ করছে। তাহলে ভারতের ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে এই হিন্দু শরণার্থীদের মধ্যে বণ্টন হবে না কেন?

কীসের কারণে ১৯৪৭ সালে এই দেশ ছেড়ে যাওয়া মুসলমানদের সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি হবে? অবিলম্বে ওয়াকফ সম্পত্তি উদ্ধার করে শরণার্থী হিন্দুদের নাগরিকত্ব দিয়ে তাদের হাতে হস্তান্তর করা হোক। প্রয়োজন হলে এসআইআর কঠোর ভাবে প্রয়োগ করে উদ্বাস্তু হিন্দুদের বাংলাদেশের মাটিতে পৃথক হিন্দু হোমল্যান্ড বানিয়ে সেখানে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যুগ যুগ ধরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তথা ভূমিপুত্ররা শুধু শুধু এত বিশাল উদ্বাস্তু বা অনুপ্রবেশকারীদের চাপ নেবে কেন?

অবিলম্বে বাংলাদেশের সঙ্গে সমস্ত রকম বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে শুরু করে সব ধরনের ভিসা দেওয়া বন্ধ করা হোক। ভারতের আকাশপথ, জলপথ ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হোক। ১৯৭১ সালের পর বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দুদের রক্ষার্থে ওখানেই হোমল্যান্ড গড়তে সমস্ত রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সেই সঙ্গে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের পুশব্যাক করে দেওয়া হোক। দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসেছে। কেন্দ্র ও রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাষ্ট্রভক্ত সরকার। সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং নির্ভীক সৈনিক শুভেন্দু অধিকারী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। সুতরাং কেন্দ্র ও রাজ্যে যৌথভাবে সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে অনুপ্রবেশকারী মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গঠন করতে হবে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নের পশ্চিমবঙ্গ সত্যিকারের স্বাধীনতা পেয়েছে ২০২৬ সালের মে মাসে এটা হলফ করে বলা যায়। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজের প্রতি সুবিচার সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, কেন্দ্র রাজ্য যৌথ উদ্যোগে এবং রাজ্যে রাষ্ট্রবিরোধী কোনো জেহাদি শক্তির যেন কোনোরকম বাড়বাড়ন্ত আর না হয় তার প্রতি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিগত একমাস ধরে মুখ্যমন্ত্রীর যে সিদ্ধান্ত ও ভূমিকা দেখছে তাতে সকলেই স্বাধীনতার আস্বাদন অনুভব করেছেন।

আশা করি আগামীদিনে জেহাদি শক্তির প্রভাব মুক্ত ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গ আবার শ্রেষ্ঠ হিসেবে নিজেদের তুলে ধরবে।

—**সিদ্ধানন্দ পুরকাইত,**
ডায়মন্ড হারবার, দ: ২৪ পরগনা।

পশ্চিমবঙ্গ দিবসের সেই সব মুসলমানরা

এক আল্লায় বিশ্বাসীদের চোখে অন্য সকল ধর্মের মানুষজন হলো অবিশ্বাসী, পাপী, কাফের তথা বধযোগ্য, যা ইসলামের দৃষ্টিতে এক পুণ্য কাজ। এহেন মানসিকতার ধারক ও বাহকরা পশ্চিমবঙ্গে রাজ ক্ষমতার পাটে আসার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা ও নোয়াখালিতে হিন্দু নিধন যজ্ঞ শুরু করেছিল। আতঙ্কিত বাঙ্গালি হিন্দুরা তখন একটি হিন্দু প্রধান বাংলা ভাষাভাষী রাজ্যের প্রয়োজন অনুভব করে। এহেন পরিস্থিতিতে দেশ ভাগ এবং মুসলমান প্রধান অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইও বটে। ব্রিটিশ সরকারের দেশভাগের পরিকল্পনা যা মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ঘোষণা করে, এই ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা অনুযায়ী ৫, ৬ ও ৭নং ধারা মোতাবেক মুসলমান প্রধান ও অমুসলমান প্রধান এলাকার আইন পরিষদের সদস্যদের ভোটাভুটিতে, বঙ্গ বিভাজন এবং কারা কোন দিকে যোগ দিবে তা ঠিক হবে। বঙ্গের পার্বত্য চট্টগ্রাম বাদ দিয়ে ১১টি হিন্দু প্রধান জেলা যথা বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগনা, কলকাতা, খুলনা, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙের ৫৮ জন সদস্য ১৯৪৭ সালের ২০ জুন দুপুরে ভোটাভুটিতে ঠিক করেন যে বঙ্গ বিভাজন হবে এবং তা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হবে।

সেদিন সদস্যদের মধ্যে ২১ জন মুসলমান ছিলেন, যারা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ও পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয়। একজন সদস্য তথা জেসি গুপ্ত অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিত ছিলেন। এই ২১ জন সদস্যের চিন্তা ভাবনা আজও মুসলমানদের মধ্যে সমানভাবে প্রযোজ্য। ভারত খেলায় হেরে গেলে আজও এরা স্ফূর্তি করে, যেন দেহটা ভারতবর্ষে মনটা পাকিস্তানে। কেউ কেউ এই দেশটাকে পাকিস্তান বানাতে চায়।

হিন্দু প্রধান জেলা সমূহের মুসলমান প্রতিনিধিদের তালিকা হলো— ডাঃ আবদুল আহাদ, সাতক্ষীরা। এএফএম আব্দুর রহমান, ২৪ পরগনা উত্তরপূর্ব। আব্দুস সবুর খান, খুলনা। আব্দুল হাসান, বর্ধমান। হুসনে আরা বেগম, কলকাতা। ইলিয়াস আলি মোল্লা, ২৪ পরগনা। এমএইচ ইস্পাহানি, মুসলিম চেম্বার্স অব কর্মাস। জসিমউদ্দিন আমেদ, ২৪ পরগনা দক্ষিণ। মহম্মদ শরিফ খান, হাওড়া। মোজাম্মেল হোসেন, বাগেরহাট। মুদাস্সর হুসেন, বীরভূম। মহম্মদ ইদ্রিস, হাওড়া। মহম্মদ কামরুদ্দিন, ব্যারাকপুর। মহম্মদ রফিক, কলকাতা উত্তর। সৈয়দ মহম্মদ সিদ্দিক, বাঁকুড়া। মুশারফ হুসেন নবাব, জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং। কে নুরুদ্দিন, কলকাতা দক্ষিণ। সিরাজউদ্দিন আহমেদ, মেদিনীপুর। হুসেন সইদ সুরাবর্দি, ২৪ পরগনা। এএম জামান, হুগলী। আব্দুল ওয়াহিদ সরকার, হুগলী। আজও এদের প্রেতাত্মা পশ্চিমবঙ্গে সমানভাবে সক্রিয়, এরা বেঁচে আছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায়।

—**রাধাকান্ত ঘোড়াই,**
পূর্ব মেদিনীপুর।

‘নহ মাতা নহ কন্যা....’ দেবদাসীদের কথা

বৈশাখী কুণ্ডু

‘কন্যারূপে পৃথিবীতে এল, তবু কারও কন্যা নয়, বধূর মতো জীবন কাটালো তবু বধূর মর্যাদা পেল না। নতুন দাসীদের নৃত্য-গীতের প্রশিক্ষণ দিল কিন্তু তবু কারোর মা হতে পারলো না।’

‘নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী’— বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘উর্বশী’ কবিতার একটি অংশ। এখানে উর্বশী শুধুমাত্র সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক হিসেবে কবি দেখিয়েছেন। কিন্তু বিভিন্ন পুরাণে ও সাহিত্যিকদের রচনায় উর্বশী, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাদের কথা অন্যভাবে পাওয়া যায়। তাঁরা স্বর্গে নৃত্য-গীত পরিবেশনের মাধ্যমে দেবতাদের মনোরঞ্জন করতো। কবির লেখা বিখ্যাত নৃত্যনাট্য শাপমোচনের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় গন্ধর্ব সৌরসেনের তালভঙ্গের কারণে নৃত্যরতা উর্বশীর নৃত্যে ছন্দপতন ঘটে। ফলস্বরূপ মর্ত্যবাস। উল্লেখ্য যে, নৃত্য-গীত বাদ্য এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে সামান্য তালভঙ্গ করলেও কঠিন শাস্তি নিশ্চিত। এই নর্তক-নর্তকী বা মর্ত্যের নট-নটিরাই ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের ধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছিল। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য লেখমালা ইত্যাদি থেকে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি বিষয়ে জানতে পারা যায়। সংস্কৃতি চর্চা বলতে নৃত্য-গীত-বাদ্য। নৃত্যে দেবদাসীদের অবদান চিরস্মরণীয়। অত্যন্ত কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে দেবদাসীদের নৃত্যে পারদর্শী হতে হতো।

এছাড়াও ৬৪ কলাবিদ্যায় পারদর্শী হতে হতো। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেবদাসী কথাটির প্রচলন হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যেমন— পাল-সেন যুগে দেববারবনিতা, দেয়াসিনী, নটী; কলিঙ্গ অঞ্চলে মাহারি। চোল রাজত্বকালে আদিগৈমার, মণিকাট্টার। চালুক্য রাজত্বে বিলাসিনী, নিত্য সুমঙ্গলী দাসী ইত্যাদি। এরা মন্দিরে-মন্দিরে নৃত্যের মাধ্যমে দেবসেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতো। আবার কখনো পণ্যরূপে ব্যবহৃত হতো। শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা বিশ্বে যেমন ইজিপ্ট, ব্যাবিলন গ্রিক ইত্যাদি জায়গায় দেবদাসী প্রথা ছিল। মূলত রাজা ও পুরোহিত শ্রেণী এদের নিয়ন্ত্রণ করতো। এরা নিজেদের কামনা বাসনা পূর্ণ করতে পারতো না। উত্তরপ্রদেশের রামগড় পাহাড়ের যোগীমারা গুহাচিত্র থেকে জানা যায়, সুতনুকা নামে এক দেবদাসী দেবদিন্ন নামে এক চিত্রশিল্পীকে কামনা করেছিল। এটি এক রাজকর্মচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং দেবদিন্নকে দণ্ডপ্রাপ্ত করা হয়েছিল। ক্রমে এই ব্যবস্থায় কলুষতা নেমে আসে। একসময় ব্রিটিশ সরকার এই দেবদাসী প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

নাট্যশাস্ত্রে নৃত্য-গীত পটিয়সী নারীদের নামের শেষে দত্তা, মিত্রা, সেনা ইত্যাদি শব্দগুলির সংযোজন থাকতো। এরা দেবদাসী, রাজদাসী ও স্বদাসী— এই তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যে নগরবধূ বা রাজদাসীদের নাম পাওয়া যায়— বাসবদত্তা, আম্রপালি, বিমলা ইত্যাদি। বিভিন্ন জৈনমন্দিরে দেবদাস থাকতো। জানা যায়, মহাবীরের সামনে নৃত্যকলাভিজ্ঞ নর্তক নর্তকীরা বত্রিশ প্রকার ভঙ্গীতে নৃত্য পরিবেশন করেছিল। গুপ্ত-পাল-সেন আমলে বঙ্গে শিল্প সংস্কৃতি চর্চার শীর্ষ স্থানে ছিল বলে জানা যায়। মহাকবি

কালিদাসের বিভিন্ন নাটক ও কাব্য যেমন মেঘদূত, মালবিকাগ্নিমিত্রম ইত্যাদিতে গুপ্ত যুগের সঙ্গীত ও সংস্কৃতি চর্চার বিবরণ পাওয়া যায়। ছালিকা নামক গন্ধর্ব পদ্ধতিতে গান ও হলিসাকা নামে দলগত নৃত্যের কথা জানা যায়। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে প্রাচীনকালের স্ত্রীলোকদের মৃদুভাসিনী, কোমলাঙ্গি ও অনুরাগিনী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কবি কলহনের লেখা 'রাজতরঙ্গিনী' থেকে দেবদাসী কমলার কথা জানা যায়। কমলা সুসংস্কৃতি সম্পন্ন এবং নৃত্য পটিয়সী ছিল।

পালযুগের কবিদের বর্ণনায় দেবদাসী, রাজদাসীদের কথা জানা যায়। বিরাট আকারের প্রাসাদ, অট্টালিকা ও মন্দিরের উল্লেখ রয়েছে যেখানে দেবদাসীরা বসবাস করতো। রাজা মহীপাল বাণগড়ে কৈলাসের মতো একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন যেখানে সহস্র দেবদাসীদের বাসস্থান ছিল। রাজপ্রশস্তিতে কবিরা বলেছেন যে, প্রতি সন্ধ্যায় নৃত্য-গীত-বাদ্যের মূর্ছনায় রাজপ্রাসাদ মুখরিত হয়ে উঠতো। সেনরাজাদের তৈরি বিষ্ণু, শিব, কার্তিক মন্দিরে পূজাপাঠের সঙ্গে দেবদাসীদের নৃত্য গীত চলত। শশীকলা, বিদ্যুৎপ্রভা ইত্যাদি রাজদাসীদের নাম পাওয়া যায় যারা সেই সময় জনসমক্ষে নৃত্য পরিবেশন করতো। রাজদাসী ও স্বদাসীদের গৌড়বঙ্গে 'নটী' বলা হতো। নবাব, সুলতান, বাদশাহদের হারেমে প্রচুর দাসী থাকতো। সাধারণত হাট থেকে এদের বেচাকেনা হতো।

বিভিন্ন দলিলপত্র থেকে জানা যায়, ইবনবতুতা মাত্র পনেরো টাকায় একটি সুন্দরী তরুণীকে কিনে আফ্রিকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় গণিকাবৃত্তির বাহুল্যের কারণ হলো প্রচুর লোকের প্রাচুর্য। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যগুলিতে নটিদের নৃত্য, গীত, পোশাক পরিচ্ছদের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বলা যেতে মঙ্গলকাব্যগুলি নৃত্য-গীতের বর্ণনায় উজ্জ্বল। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা দেবদাসী রাখতো। এদের জন্য দেবদাসী বা নটীপাড়া ছিল। রাজা এদের জমি অর্থ সবই দিতেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এরা নৃত্য গীত পরিবেশন করতো। দুর্গাপূজার সময় দেবীকে স্নান করানোর সময় অষ্টপ্রহরে নটীরা আটটি রাগে গান গাইতো এবং চামর ও পূজা উপাচারের ডালি নিয়ে নৃত্য করতো। বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন মন্দিরের নৃত্য ভাস্কর্যগুলি এইসব নটনটীদের নৃত্যের কথাই বলে। রাজারা নাচনির রসিক বা নাট্টুভান ছিল। ঝুমুর গানে-নাচে এইসব অঞ্চল একসময় মুখরিত ছিলেন। নাচনির উপার্জনে রসিকের সংসার চলতো। অথচ রসিকের আলাদা সংসার ছিল। রসিকের সংসারে নাচনিরা উপপত্নী স্বরূপ।

এসব আলোচনায় একটি বিষয় দেখা গেল যে, দেবদাসী সম্প্রদায় দেবমন্দিরে বা রাজসভায় শাস্ত্রীয় নৃত্যগীত উপস্থাপন করতো এবং তাদের হাত ধরেই পরবর্তী সময়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ধারা অব্যাহত ছিল। তারা যে কঠিন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছে তারফলে পরবর্তী প্রজন্ম জেনেছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের (নৃত্য গীত বাদ্য) গভীরতা। বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থ ও ভাস্কর্যগুলি দেবদাসীদের এই নৃত্যকুশলতার পরিচয় বহন করে। ভারতবর্ষের বুকে যে শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলি দেখা যায় তাদের হাত ধরেই আজ এগিয়ে এসেছে। তারা সমাজের কাছে তাদের শিল্পনৈপুণ্য উজাড় করে দিয়েছে কিন্তু সমাজের থেকে তারা ন্যূনতম সম্মানটুকু পায়নি।

বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায় যে, দেবদাসী, রাজদাসী বা স্বদাসীরা রাজ পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। সেই সময় কেউ কেউ মন্দিরে দেবদাসী নিয়োগের বিরুদ্ধাচরণ করলেও তা ধোপে টেকেনি। কারণ রাজা ও রাজ পুরোহিতরা এদের নিয়ন্ত্রণ করতো। কিন্তু রাজতন্ত্র চলে যাবার পর এরা মূলত পথে এসে দাঁড়ালো। ধনী ব্যক্তির অনুষ্ঠান বাড়িতে নাচ-গানের আসরে ডাক পড়তো। চটুল নৃত্যের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে বাধ্য হলো। কেরালার দাসীরা হাটে-বাজারে জনসমক্ষে এসে চন্দনম, মুকুতি, ইসাল, পোলকলি ইত্যাদি সস্তার নাচ করে অর্থ উপার্জন করতো। নাচ, নাগর, নাচনি— এই তিন নিয়েই ছিল মানভূমের প্রমোদ জীবন। কিছুটা সামাজিক ভাবনা এবং অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হওয়ার ফলস্বরূপ দেবাদাসী প্রথার উদ্ভব। কিশোরী কন্যাকে মন্দিরে উৎসর্গ করলে পরিবার ও আপন সম্প্রদায়ের জন্য দেবতার আশীর্বাদ লাভ করা যাবে। দেবতাকে স্বামীরূপে পেলে জীবন ধন্য হবে। আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুরোহিত শ্রেণীর কামনা মেটাতো এইসব কন্যারা। কন্যাদের বোঝানো হতো যাতে তারা বিবাহ না করে। দেবতার কাছে কন্যা সমর্পণ করলে জমি অর্থ ইত্যাদি পরিবার পাবে। আবার কেউ স্বেচ্ছায় নিজেকে দেবতার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করতো। এদের জীবনে বঞ্চনার শেষ নেই।

দেবতার নামে অসৎ কাজের অন্ত নেই। দেবদাসীর রূপ যৌবন ফুরিয়ে গেলে নতুন দাসী নিয়োগ করা হতো। বিগতা দাসীদের মন্দিরে ঠাঁই হতো না। এক বিচিত্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি শংসাপত্র দিয়ে বিদায় জানানো হতো। রাজদাসীদের অবস্থাও একই রকম। তখন তাদের না থাকে যৌবন, না থাকে পরিবার, না থাকে অন্নের সংস্থান। সমাজের কাছে আবর্জনা। সমাজে সুস্থ শিল্প সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে সারা জীবন উৎসর্গ করল, পরিবর্তে সমাজের কাছে পেল শুধুই বঞ্চনা।

তাদের উদ্দেশ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা পঙ্‌ক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—

'নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী'

কন্যারূপে পৃথিবীতে এল, তবু কারও কন্যা নয়, বধূর মতো জীবন কাটালো তবু বধূর মর্যাদা পেল না। নতুন দাসীদের নৃত্য-গীতের প্রশিক্ষণ দিল কিন্তু তবু কারোর মা হতে পারলো না। □

হিন্দু-সাম্রাজ্য দিনোৎসব : বর্তমান প্রেক্ষাপটে

ডাঃ শিবাজী ভট্টাচার্য

ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল সুপ্রাচীন ইতিহাসের ধারা হঠাৎ যেন থমকে গেল, সনাতন ধর্ম আধারিত ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা অকস্মাৎ যেন পথ হারাল ঘোর কাল কুয়াশার আবর্তে। ৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ। বর্বর, রক্তপিপাসু, লুণ্ঠনকারী মুসলমান আরব দস্যুরা কাবুলে পৌঁছায়। আরব সেনাপতি মুহল্লাব ভারতবর্ষে হামলা চালিয়ে মুলতান পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সেই শুরু। ভারতের ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে উঠল কালমেঘের ঘনঘটা। যদিও প্রায় আশি বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর হিন্দু বীরেরা সিন্ধুদেশ অবধি ধাবমান আরবদের প্রতিহত করে তাদের হটিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু দশম শতকের শেষ অবধি আগ্রাসী মুসলমান আক্রমণকারীদের সঙ্গে হিন্দু রাজাদের ঘোর সংঘর্ষ লেগে যেত মাঝে মধ্যেই। তারপর ১০০১ থেকে ১০২৪ সাল পর্যন্ত গজনির সুলতান মামুদ একাই ভারতবর্ষ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেছে মোট ১২ বার। কত মঠ, মন্দির, জনপদ যে ধ্বংস হয়েছে তা শুনলে শিউরে উঠতে হয়। গুজরাটের বিশাল সোমনাথ মন্দিরও ধ্বংস হয় মামুদের বারো বার আক্রমণে।

তারপর সময় যত এগিয়েছে ভারতবর্ষের তথা হিন্দুদের পরাধীনতার শৃঙ্খল তত ভারী হয়েছে। একে একে গজনভি বংশ (৯৯৯-১১৫২), ঘুর বংশ (১১৫২-১২০৬), দিল্লির দাস রাজারা (১২০৬-১২৮৮), খিলজি বংশ (১২৮৮-১৩২১), তুঘলক বংশ (১৪৫০-১৫২৬)— বিভিন্ন ভাবে হিন্দুদের পদানত করে ভারতবর্ষের নানা অংশ শাসন করেছে, করেছে শোষণ। মুসলমান শাসকদের অত্যাচার আর লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে হিন্দু রাজারা স্থানে স্থানে প্রতিরোধ গড়ে তুললেও সামগ্রিক ভাবে সুসংহত ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ না থাকায় মধ্যযুগীয় বর্বর শাসন ভারতবর্ষের উপর উত্তরোত্তর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে। হিন্দু চেতনা তথা রাষ্ট্র ভাবনা ও দেশাত্মবোধ উত্তরোত্তর ক্ষয়িষ্ণু হয়েই চলল। এল মুঘল যুগ। তৈমুরলঙ্গের বংশধর বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে দিল্লি ও আগ্রা দখল করে কায়েম করল মুঘল শাসন। শুরু হলো হিন্দুদের সর্বনাশের আরেক অধ্যায়। পর পর মুঘল শাসকদের অত্যাচারে হিন্দু সংস্কৃতি, দেশীয় শ্রদ্ধাস্থলগুলি ক্রমশ কোণঠাসা ও ভূলুণ্ঠিত হতেই থাকল।

ছলে-বলে-কৌশলে হিন্দু রাজ্য লুণ্ঠন ও আত্মসাৎ, হিন্দু নারীর অসম্মান, হিন্দু ধর্মাচরণে বাধা এবং হিন্দুদের ইসলাম ধর্মান্তরিত করা— এই ছিল মুঘল শাসকদের প্রাথমিক লক্ষ্য। কোরান ও তরবারির মাঝখানে পড়ে স্বধর্ম রক্ষায় কত হিন্দু বীর

যে প্রাণ দিয়েছেন, ইসলামি শাসকদের লোলুপ দৃষ্টি ও স্পর্শ থেকে বাঁচতে কত হিন্দু রমণী যে জহরব্রত পালনে আত্মাহুতি দিয়েছেন তার কোনো ইয়ত্তা নেই। যখন আত্মবিস্মৃত বহু হিন্দুজাতি নিজ দেশ ও ধর্মের প্রতি দায়িত্ব পালনে পরান্মুখ হয়ে 'দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' মেনে নিয়েছেন তখন ভারতবর্ষের পশ্চিমতটে মহারাষ্ট্র প্রদেশে এক বীর মহাপুরুষের জন্ম হয় (১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৬৩০)। সহস্র বছরের পরাধীনতা ও আত্মবিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে হিন্দু জাতি তথা ভারতবর্ষকে আবার স্বাধীনতার আলো দেখাতে এবং আত্মশক্তির পুনর্স্থাপনে উদ্বোধিত করতে যে বীর আবির্ভূত হলেন তিনি হিন্দুকুলগৌরব ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ। হাজার বছর ধরে ক্রমাগত ইসলামি শাসকদের নানাবিধ অত্যাচার ও যুদ্ধবিগ্রহের ফলে যে দেশ খণ্ড, ছিন্ন বিক্ষিপ্ত, সেই রাজনৈতিক অবক্ষয়ী প্রেক্ষাপটে শিবাজী মহারাজের ভাবনা 'এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি'— সারা দেশে তথা হিন্দু মানসে এক নবচেতনা সঞ্চারিত করেছিল। শিবাজী মহারাজেরও প্রখর বুদ্ধি, বিপুল পরাক্রম ও দুর্মর প্রতিজ্ঞা 'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' সমগ্র সুপ্ত জাতিকে উদ্বেলিত করেছিল, অনুপ্রাণিত করেছিল স্বাজাত্যভিমানে।

বুদ্ধির ও শক্তির খেলায় হিন্দুপাদ পাদশাহী ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের কাছে আওরঙ্গজেব এমনভাবে বারবার পর্যুদস্ত হয়েছেন যে, কার্লমার্কস রসিকতা করে ওই মুঘল সম্রাটের ব্যবহারকে 'গাধা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন।

পুণার প্রত্যন্ত পার্বত্য প্রদেশের মাওয়ালিদের সমর কৌশল শিক্ষা দিয়ে তাদের উন্নত যোদ্ধায় পরিণত করেন ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ এবং ছোটো ছোটো সেনাদল তৈরি করে বিপক্ষের বড়ো সেনা দলকে অতর্কিতে আক্রমণ করার কৌশলে বিজাপুর সুলতান কিংবা মুঘল বাদশার সৈন্যদলকে বারবার পর্যুদস্ত করেন তিনি। অসংখ্য গেরিলা যুদ্ধে সফলতার ফসল হিসেবে বহু গুরুত্বপূর্ণ দুর্গম ও অজেয় গিরিদুর্গ দখল করেন এবং ক্রমে দক্ষিণ ভারতে একটি স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। রায়গড় দুর্গে তাঁর রাজ্যাভিষেকের দিনটি (জ্যৈষ্ঠ শুক্ল ত্রয়োদশী, ৬ জুন, ১৬৭৪) হিন্দু সমাজের কাছে একটি শুভদিন। কারণ তা পরাধীন মুঘল ভারতবর্ষে হিন্দু জনমানসে স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিয়েছিল; মুসলমান শাসনের নাগপাশ থেকে ভারতবর্ষের আপামর হিন্দুর মুক্তির দিন ঘোষিত হয়েছিল। ফিরে এসেছিল স্বাভিমান— তাই সেই দিনটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব' রূপে পরিচিত।

বুদ্ধির ও শক্তির খেলায় হিন্দুপাদ পাদশাহী ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের কাছে আওরঙ্গজেব এমনভাবে বারবার পর্যুদস্ত হয়েছেন যে, কার্লমার্কস রসিকতা করে ওই মুঘল সম্রাটের ব্যবহারকে 'গাধা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জীবন ও কর্মপদ্ধতি, তাঁর ব্যক্তি নির্মাণের আদর্শ তাঁকে কুশলী রাষ্ট্রনেতার মর্যাদা দিয়েছে। তাই তাঁর রাজ্যাভিষেকের দিনটিকে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনের দিন হিসেবে, বিদেশি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম ও আত্মশক্তির পুনরুত্থানের দিন হিসেবে পালন করার জন্য লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক সমগ্র দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন--- পালিত হলো 'শিবাজী উৎসব'। পূর্ব ভারতে এই উৎসবের প্রবর্তন করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি আহ্বান জানালেন,— 'মারাঠির সঙ্গে আজি, হে বাঙ্গালি, এক সঙ্গে চলো মহোৎসবে সাজি।'

ব্রিটিশ শাসন অবসান কল্পে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী শিবাজী মহারাজের জীবন ও কর্ম থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছেন, 'ভারতীয়দের সামনে স্বাধীনতা যুদ্ধে সফলতা লাভের জন্য শিবাজী মহারাজের উদাহরণ রাখা উচিত।' 'অভিনব ভারত' দলের সদস্যরা শিবাজী মহারাজের চিত্রের সামনে শপথ নিতেন। আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে, 'তিনিই (শিবাজী) আধুনিক আত্মসচেতন হিন্দু জাতির পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভের দীক্ষাদাতা।'

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ চলে গেছেন সেই কবে (৬ এপ্রিল, ১৬৮০), কিন্তু তিনি তাঁর মাত্র পঞ্চাশ বছরের জীবন সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দু জাতিকে হাজার বছরের পরাধীনতার গ্লানি থেকে উদ্ধারের পথ দেখিয়েছেন, জাগিয়ে তুলেছেন জাতির বিজিগীষু ভাব ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ। তাই এত বছর পরেও ক্রমাগত নানাবিধ আক্রমণে যখন আমাদের দেশ, জাতি সংস্কৃতি নানাভাবে আক্রান্ত হচ্ছে, বিধ্বস্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত আমাদের স্বধর্ম লালিত মূল্যবোধ, তখন শিবাজী মহারাজের আদর্শ সমান প্রাসঙ্গিক, সমান অর্থবহ। তাই হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব পালনে আমরা ছত্রপতি শিবাজীকে স্মরণ করে প্রার্থনার ভাষাতেই জানাই—

'হে বীর,
আমরা, হিন্দু রাষ্ট্রের, সন্তানরা তোমাকে প্রণাম করি।
তোমারই কাজে কোমর বেঁধেছি। আশীর্বাদ করো।
আমাদের সেই শক্তি দাও, যাতে পৃথিবীর কেউ
আমাদের আর পরাজিত করতে না পারে।
আমাদের শুদ্ধ চরিত্রবলে বলীয়ান কর।
সেই চরিত্র দাও যা সারা বিশ্বে মান্য হবে।
সেই জ্ঞান দাও যাতে স্বেচ্ছায় যে কণ্টকময় পথে
চলেছি তা সুগম হয়ে উঠবে।' ◻

নাগপুরে কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ দ্বিতীয়-র সমাপন অনুষ্ঠান

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ২৫ দিন ব্যাপী কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ দ্বিতীয়-র সমাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো গত ৪ জুন নাগপুরের রেশিমবাগ ময়দানে। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি পদ্মভূষণ কুমার মঙ্গলম বিড়লা, প্রান্ত সঙ্ঘচালক দীপক তামশোট্টিয়ার, নাগপুর মহানগর সঙ্ঘচালক রাজেশ লোয়া এবং বর্গ সর্বাধিকারী মহেন্দ্র সিংহ মগ্গো। প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রশিক্ষিত কার্যকর্তারা নানারকম শারীরিক কলাকৌশল প্রদর্শন করেন।

পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক প্রশিক্ষিত ৮৮০ জন কার্যকর্তা এবং উপস্থিত কয়েক হাজার নাগরিকদের উদ্দেশে বলেন, সারা বিশ্ব মেনে নিয়েছে, আগামী যুগ ভারতের যুগ। তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এজন্য সম্পূর্ণ সমাজকে স্ব-বোধে উদ্বুদ্ধ করে দেশের জন্য সক্রিয় হতে হবে। স্ব-বোধের ভিত্তিতে স্বার্থ ও মতভেদের ঊর্ধ্বে উঠে সমাজ ও বিশ্বের জন্য দেশকে তৈরি রাখতে হবে। যদি এরকম করা যায় তবে স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের ভারত আগামী দুই-তিন দশকের মধ্যেই নির্মাণ হবে।

তিনি বলেন, নেতিবাচক বিষয় মানুষের চোখে তাড়াতাড়ি পড়ে। তারা সংকটের পরিস্থিতিই শুধু দেখেন কিন্তু তারা ভাবেন না যে তাদেরও কিছু করার আছে। যাদের নিজের শক্তির উপরে বিশ্বাস রয়েছে তারা তার মুখোমুখি হতে পারেন। এক সময় ছিল যখন ভারত বিশ্বগুরু ছিল। কিন্তু যখন আমরা আমাদের প্রস্তুতি ও তৎপরতা হারিয়ে ফেলেছি, তার পরিণামে আমাদের হাজার বছর পরাধীনতা ভোগ করতে হয়েছে। বর্তমানে ভারতই বিশ্বকে নতুন পথ দেখাতে পারে। ভারতের অনুকূল সময় এসে গেছে, এর জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে। এই সময় অন্যকে নকল করলে চলবে না। আমাদের নিজস্ব দর্শনের ভিত্তিতেই নতুন পথ নির্মাণ করতে হবে। এর জন্য স্ব-বোধসম্পন্ন, স্পষ্ট বিবেকবান মানুষের প্রয়োজন। এরূপ পরিবেশ নির্মাণকারী ব্যক্তি নির্মাণের কাজ সঙ্ঘ কাজ করে চলেছে। সঙ্ঘকে কেবল দেশের জন্যই করতে হবে। সমাজের সংগঠিত শক্তিতেই দেশের উত্থান সম্ভব।

বিশ্ব তার কথাই শোনে, যার কাছে শক্তি রয়েছে। পৃথিবীতে যে স্বার্থের সংঘর্ষ চলছে তারফলে বহু দেশ প্রভাবিত হচ্ছে। ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ চলছে, তার ফলে আমাদের দেশে তেলের দাম বেড়ে চলেছে। যাদের শক্তি আছে তারা যে কারও ওপর বোমা ফেলছে। অন্য দেশকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে অথবা তেল সরবরাহ বন্ধ করে দিচ্ছে। যাদের কাছে শক্তি নেই তারা মাথা নত করে চুপ করে আছে। বিশ্ব তাকে মান্য করে যার কাছে শক্তি আছে। ভারত শক্তিশালী হলে বিশ্ব আমাদের কথা শুনবে। তখন আমাদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পালটে যাবে।

সরসঙ্ঘচালক মহোদয় বলেন, ভারত যাতে শক্তিশালী হতে না পারে সেজন্য দেশবিরোধী শক্তিগুলি সক্রিয় রয়েছে। দেশকে দুর্বল করার জন্য তারা লেগে রয়েছে। ছোটো ছোটো অজুহাত খাড়া করে দেশের সমাজ-জীবনেকে অশান্ত করার চেষ্টা করে চলেছে। ভারত যদি শক্তিশালী হয় তো তাদের ক্ষতি হবে। সেজন্য তারা ভারতের উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে।

Today's Choice.....
Vandana®
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

বেহালায় বঙ্গনারীশক্তির গায়ত্রীপূজন ও নামসংকীর্তনের অনুষ্ঠান

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে নারীসমাজের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সামাজিক কল্যাণের প্রত্যাশাকে সামনে রেখে গত ৭ জুন বঙ্গনারীশক্তির উদ্যোগে বেহালা রায়বাহাদুর রোডে রায়নগর মাঠ সংলগ্ন পরিসরে এক ভাবগম্ভীর আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিকেল ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানে গায়ত্রীপূজা, ভারতমাতাপূজা, প্রদীপ প্রজ্বলন, আরতি এবং ভক্তিমূলক নাম-সংকীর্তনের মাধ্যমে এক পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের মা-বোন ও বিশিষ্ট মহিলারা উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন সমাজসেবী বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অর্চনা মজুমদার, পূর্ব বেহালার বিধায়ক শঙ্কর শিকদার এবং বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী সঞ্চিতা ভট্টাচার্য এবং মহিলা সমন্বয়ের সম্পর্ক অধিকারী সুব্রত রায়। এছাড়াও বঙ্গনারীশক্তির সদস্যা এবং এলাকার বহু মহিলা।

অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের নারীসমাজের জন্য এক নিরাপদ, সম্মানজনক ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশের প্রত্যাশাকে ব্যক্ত করা। বিগত কয়েক বছরে নানা সামাজিক, পারিবারিক ও নিরাপত্তাজনিত সংকটের মুখোমুখি নারীসমাজ বর্তমান সময়ে এক নতুন আশার আলো দেখছেন। সেই আশাকে স্বাগত জানিয়ে এবং সমগ্র সমাজের মঙ্গল কামনায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

নামকীর্তনের সুর, শতাধিক প্রদীপের আলো এবং সমবেত আরতির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান স্থল এক অনন্য আধ্যাত্মিক আবহে মুখরিত হয়ে ওঠে। শেষে সমবেত কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের মনে নতুন আশা, ঐক্য ও সমাজ কল্যাণের এক ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেয়।

রামকৃষ্ণ দিকদর্শন সেবাশ্রমে 'বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ'

গত ১০ জুন উত্তর কলকাতার বরানগরে বনহুগলী-স্থিত রামকৃষ্ণ দিকদর্শন সেবাশ্রমে অনুষ্ঠিত হয় 'বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ'। সাধিকা খনা মা'র এই আশ্রমে এদিন বিশ্ব শান্তি যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি বীরেন্দ্রজী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক চন্দ্রনাথ দাস, ধর্ম জাগরণ সমন্বয় সমিতি, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সহ-সংযোজক রতন চক্রবর্তী-সহ ধ্যানব্রতানন্দ গিরি মহারাজ, প্রকাশ ব্রহ্মচারী, প্রতীক মহারাজ প্রমুখ সাধুসন্ত। সকল বিশিষ্টজন ও সাধুসন্তদের গৌরবময় উপস্থিতিতে এদিন এই যজ্ঞানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। বনবাসী কল্যাণ আশ্রম ও প্রতিভা বিকাশ কেন্দ্রের অনেক আচার্য-সহ রামকৃষ্ণ দিকদর্শন সেবাশ্রমের শিষ্য-শিষ্যারা এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। যজ্ঞ শেষে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ উত্তরবঙ্গ প্রান্তের পরিষদ বর্গের সমাপন অনুষ্ঠান

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ উত্তরবঙ্গ প্রান্তের পরিষদ বর্গ মালদা জেলার ঘাকশোল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে গত ১ থেকে ১০ জুন সম্পন্ন হয়। ১০ জুন বিকেলে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মাঠে সমাপন সমারোহ অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি কেশব গৌড়ীয় মঠের স্বামী স্বজন মহারাজ, ঘাকশোল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মঠাধ্যক্ষ স্বামী বৈবস্বতানন্দ মহারাজ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কলকাতা ক্ষেত্রের সংগঠন মন্ত্রী সোহন সিংহ সোলাঙ্কি, ক্ষেত্র সম্পাদক অমিয় কুমার সরকার, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল, বর্গের বর্গাধিকারী নিখিলচন্দ্র মজুমদার, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্বক্ষেত্রের সামাজিক সমরসতা প্রমুখ গৌতম সরকার, সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ সহ-প্রান্ত প্রচারক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী। এছাড়াও ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ-সভাপতি তপন দাস, পূর্বতন প্রান্ত সভাপতি বিদ্রোহী সরকার, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী অনুপ কুমার মণ্ডল-সহ বুবাই নস্কর, লক্ষ্মণ বনসল, গোপাল কুণ্ডু প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রথমে পুরুষদের এবং পরে মহিলাদের শারীরিক প্রশিক্ষণের প্রদর্শন হয়। আশীর্বচন দান করেন স্বামী বৈবস্বতানন্দ মহারাজ, ভাষণ দেন স্বামী স্বজন মহারাজ। প্রধান বক্তা হিসেবে ভাষণ রাখেন অদ্বৈতচরণ দত্ত। তারপর ভাষণ রাখেন অমিয় কুমার সরকার, নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল। বর্গের প্রতিবেদন পাঠ করেন বর্গাধিকারী নিখিলচন্দ্র মজুমদার। বর্গে উত্তরবঙ্গ প্রান্তের ১১টি জেলা, ৪৮টি প্রখণ্ড এবং ১১১টি গ্রাম থেকে ১৮০ জন কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষক ও ব্যবস্থা বিভাগ মিলে মোট ২৩০ জন উপস্থিত ছিলেন। সর্বব্যবস্থাপ্রমুখ হিসেবে ছিলেন মালদা জেলা সম্পাদক তাপস সুকুল এবং গাজোলের সভাপতি মানবেন্দ্র সরকার।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন গাজোলের সম্পাদক অনুপম গোস্বামী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মানবেন্দ্র সরকার।

‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে চেতলায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

গত ৫ জুন ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ‘মেরা যুবভারত, দক্ষিণ কলকাতা’, সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) ও চেতলা হিন্দ সঙ্ঘ যৌথভাবে পরিবেশ সচেতনতা পদযাত্রা, চারাগাছ প্রদান ও বৃক্ষরোপণের আয়োজন করে। হিন্দ সঙ্ঘ ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা পাপিয়া অধিকারী এদিন এই পদযাত্রার সূচনা করেন। প্রথমে পরিবেশ রক্ষার শপথবাক্য পাঠ করান বিধায়িকা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসএসবি-র ইন্সপেক্টর অজিত রঞ্জন এবং অন্যান্য জওয়ানরা।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ‘মেরা যুবভারত, দক্ষিণ কলকাতা’র অ্যাকাউন্ট্যান্ট আনন্দ মণ্ডল। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন ‘হিন্দ সঙ্ঘ’-এর সভাপতি তথা নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সম্পাদক প্রণব গুহ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন চেতলা থানার অতিরিক্ত আধিকারিক নীলাদ্রি শেখর দুবে-সহ ‘লায়ন্স, ক্লাব অফ কলকাতা---সাফল্য সম্প্রীতি’র সদস্যরা। হিন্দ সঙ্ঘ ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে চেতলা পার্কে পৌঁছে পদযাত্রাটি শেষ হয়। পদযাত্রা শেষে চেতলা পার্কে বৃক্ষরোপণে হাত মেলান এসএসবি জওয়ানরা-সহ ‘হিন্দ সঙ্ঘ’-এর সদস্যরা।

ফ ঃ ৪

প্রোগ্রেসিভ কমিউনিটি হলে 'বই-ভবের বইপ্রকাশ' অনুষ্ঠান

বর্তমান সময়ে যখন সাহিত্যজগতের একটি বড়ো অংশ বাজারকেন্দ্রিক প্রবণতার চাপে নানা প্রশ্নের মুখোমুখি, তখন গুণগতমানসম্পন্ন সাহিত্যচর্চাকে কেন্দ্র করে এক ব্যতিক্রমী সাংস্কৃতিক উদ্যোগের সাক্ষী থাকল গিরীশ পার্কের প্রোগ্রেসিভ হল। গত ৬ জুন মধ্য কলকাতায় গিরীশ পার্ক সংলগ্ন প্রোগ্রেসিভ কমিউনিটি হলে বই-ভব পাবলিশার্সের উদ্যোগে 'বই-ভবের বইপ্রকাশ'-শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এদিন বই-ভব পাবলিশার্সের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় এক বর্ণাঢ্য সাহিত্য বাসর, যেখানে বই প্রকাশ, গ্রন্থ-আলোচনা, কবিতা পাঠ এবং সমকালীন সাহিত্য ভাবনার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এক প্রাণবন্ত সাহিত্যিক পরিবেশ। এই অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল একাধিক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন। পাশাপাশি হয় একাধিক কবির কবিতাপাঠ। এছাড়াও গ্রন্থ সমালোচনাও ছিল এদিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। এদিন প্রকাশ পায় যে গ্রন্থগুলি, তার মধ্যে অন্যতম হলো— বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী পরিবারের সদস্য সুব্রত চাকী সংকলিত 'প্রতিদিন স্মৃতির মণিকোঠায়' (দিনলিপির ডায়েরি সংকলন), কথাকার সলিল বিশ্বাস রচিত উপন্যাস 'টঙ্গাবতী থেকে ভাগীরথী' এবং কবি অসীম কুমার মিশ্রের কাব্যগ্রন্থ 'ভিতর বাহিরে আছো তুমি'। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক সায়ন্তন বসু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুব্রত চাকী, লেখক ও সাংবাদিক শমীক স্বপন ঘোষ, বিশিষ্ট লেখক অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়, সাংবাদিক দেবারুণ রায়, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ড. মনোরঞ্জন সরদার, কবি অসীমকুমার মিশ্র, কবি চৈতালী রায়, লেখক সলিল বিশ্বাস, তরুণ সাহিত্যিক আবীরলাল মণ্ডল প্রমুখ বিশিষ্টজন। প্রকাশিত বইগুলির ওপর বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য রাখেন শমীক স্বপন ঘোষ, দেবারুণ রায়, ড. মনোরঞ্জন সরদার প্রমুখ বিশিষ্ট গুণীজন। বিভিন্ন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল সুশৃঙ্খল ও মনোগ্রাহী। সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে, প্রচলিত অনুষ্ঠানের বাইরে বেরিয়ে এসে একটি নতুন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বই-ভব পাবলিশার্স। এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনায় প্রকাশিত হয় সুব্রত চাকীর তথ্যসংকলনধর্মী গ্রন্থ--- 'প্রতিদিন স্মৃতির মণিকোঠায়'। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সমূহের তথ্যভিত্তিক উপস্থাপনার জন্য গ্রন্থটির বিশেষ তাৎপর্যের বিষয়টি বিশদে আলোচনা করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক শমীক স্বপন ঘোষ। এরপর প্রকাশিত হয় সলিল বিশ্বাস রচিত ইতিহাস-আধারিত উপন্যাস 'টঙ্গাবতী থেকে ভাগীরথী'। বঙ্গীয় ইতিহাস ও কল্পনার সৃজনশীল মেলবন্ধনে নির্মিত এই ভাবসমৃদ্ধ উপন্যাসটির ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন গবেষক ও প্রাবন্ধিক ড. মনোরঞ্জন সরদার ও জনপ্রিয় সাংবাদিক দেবারুণ রায়। তাঁদের আলোচনায় উঠে আসে উপন্যাসটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং বাঙ্গালির অতীত গৌরব। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সায়ন্তন বসু 'সমকালীন বাংলা সাহিত্য ও তার ভবিষ্যৎ' বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করেন। এছাড়াও প্রকাশিত হয় কবি অসীমকুমার মিশ্রের কাব্যগ্রন্থ 'ভিতর বাহিরে আছো তুমি'। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন বর্ষীয়ান কবি চৈতালী রায়। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে বই-ভব পাবলিশার্সের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সাহিত্যকে বাণিজ্যিক সাফল্যের মাপকাঠিতে বিচার করার প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে গুণগতমানসম্পন্ন সাহিত্য প্রকাশ ও প্রসারের লক্ষ্যে বই-ভব পাবলিশার্সের লড়াই অব্যাহত থাকবে।

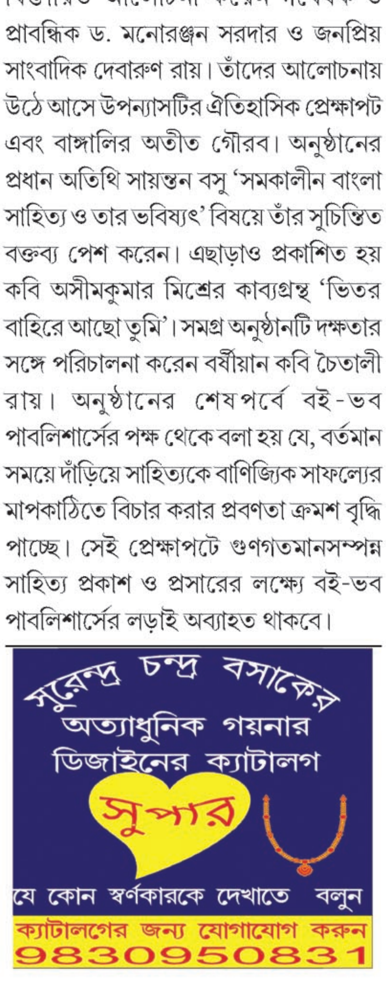

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের সংগঠন পরিচিতি বর্গ

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের মালদা জেলা শাখার উদ্যোগে গত ৯ জুন মালদা মহিলা মহাবিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে 'সংগঠন পরিচিতি বর্গ-২৬'-এর আয়োজন করা হয়। বর্গে জেলার বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় ও গৌড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৩০ জন অধ্যাপক- অধ্যাপিকা অংশগ্রহণ করেন। বর্গে সভাপতিত্ব করেন মালদা জেলা এবিআরএসএম (উচ্চশিক্ষা)-র সভাপতি ডঃ নিরঙ্কুশ চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন সংগঠনের রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক ডঃ অনুপ কুমার কারক এবং বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদা বিভাগ কার্যবাহ অধ্যাপক শ্যামল পাল। প্রদীপ প্রজ্বলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে বর্গের শুভারম্ভ হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন মন্ত্র উচ্চারণ করেন সংগঠনের মহিলা প্রমুখ সঙ্ঘমিত্রা সরকার। সরস্বতী বন্দনার পরে অতিথিদের উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেন যথাক্রমে জেলা কোষাধ্যক্ষ ডঃ সুরঞ্জন সরকার, শিক্ষণ প্রমুখ দেবব্রত রায় এবং মিডিয়া প্রমুখ অধ্যাপক শ্যামল ঘোষ। প্রধান অতিথি ডঃ অনুপকুমার কারক তাঁর বক্তব্যে এবিআরএসএম (উচ্চশিক্ষা)-এর আদর্শ সাংগঠনিক দর্শন এবং উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সংগঠনের বহুমাত্রিক ভূমিকা সম্পর্কে বিশদ আলোকপাত করেন। বিশেষ অতিথি অধ্যাপক শ্যামল পাল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ইতিহাস, দর্শন ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি সমাজজীবনে চরিত্রগঠন, সেবাভাবনা, অনুশাসন এবং জাতীয় ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় স্বয়ংসেবকদের ভূমিকার বিষয় তুলে ধরেন। সভাপতির ভাষণে ডঃ নিরঙ্কুশ চক্রবর্তী উচ্চশিক্ষার সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ, শিক্ষকদের দায়িত্ববোধ এবং সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আলোচনা করেন। বর্গ সঞ্চালনা ও প্রস্তাবনা পাঠ করেন মালদা জেলা সম্পাদক ড. তন্ময় পোদ্দার এবং গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রমুখ ড. বাপি মিশ্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শান্তিমন্ত্রোচ্চারণের পর বর্গের সমাপ্তি হয়।

'ন্যাশনাল মেডিকোস অর্গানাইজেশন'-এর উদ্যোগে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' উদ্‌যাপন

গত ৫ জুন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'ন্যাশনাল মেডিকোস অর্গানাইজেশন (এনএমও), দক্ষিণবঙ্গ'-এর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজে বড়ো মাপের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আয়োজিত হয়। কলেজগুলির ছাত্র-ছাত্রী, এনএমও সদস্যরা, যাঁরা ভবিষ্যতে দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা-প্রদানকারী চিকিৎসক হতে চলেছেন, তাঁরা জানান যে, একটি সুস্থ সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি হলো সুস্থ, দূষণমুক্ত পরিবেশ। জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে কোনো উদ্ভিদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' উদ্‌যাপনের এই উদ্যোগের মাধ্যমে এনএমও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতার প্রচার-প্রসার এবং তরুণ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল শিক্ষার্থীদের মানুষের স্বাস্থ্য-সহ প্রকৃতি রক্ষায় সক্রিয় দায়িত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে চায়। এনএমও-র পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, তাঁদের সংগঠনের সকলে পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে সংকল্পবদ্ধ এবং প্রকৃতির পরিচর্যায় তারা সর্বদা সক্রিয় থাকবেন। এদিনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে এনএমও-র ২০টি মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাস ইউনিট, ৫টি ডেন্টাল কলেজ ক্যাম্পাস ইউনিট ও ৮টি নন-ক্যাম্পাস ইউনিট। ১০৯৩ জন মেডিক্যাল ও ডেন্টাল শিক্ষার্থী ও ২১৫ জন চিকিৎসকের যোগদানে এদিনের কর্মসূচিটি একটি সর্বাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। সবুজ পরিবেশ এবং সকলের জন্য সুস্থ ও সুষম ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লক্ষ্যে মোট ৭০৯টি বৃক্ষচারা এদিন রোপণ করা হয়।

ধন-ধান্য সভাগৃহে ‘সনাতন চেতনা ও রামরাজ্য জাগরণ’ শীর্ষক সভা

গত ৭ জুন কলকাতা-স্থিত ধন-ধান্য সভাগৃহে আয়োজিত হয় ‘সনাতন চেতনা ও রামরাজ্য জাগরণ’শীর্ষক একটি সভা। সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের প্রেরণাপুরুষ তথা শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী গোবিন্দ দেব গিরি মহারাজ, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিশিষ্ট আইনজীবী অশ্বিনী কুমার উপাধ্যায়-সহ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও উদ্যোগপতি গোবিন্দ সারদা, সাম্বরমল ধনানিয়া ও শ্রীকুমার লাখোটিয়া। শ্রীমতী সঙ্গীতা সঞ্জবী পরিবেশিত গানের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। শাল পরিয়ে, পুষ্পস্তবক-সহ বিশিষ্ট অতিথিদের সম্মাননা জ্ঞাপন করেন অমিত সারদা, আদিত্য সারদা, সঞ্জয় মল্ল ও অভ্যুদয় সারদা। সভামঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে অভ্যর্থনা জানান বিশিষ্ট উদ্যোগপতি হরিমোহন বাঙ্গড় ও পদ্মশ্রী সজ্জন ভজঙ্কা।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতিতে এদিন সভাগৃহটি ছিল পরিপূর্ণ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন— জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিজয় ওঝা, ব্যারাকপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী, সোনারপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দেবাশিস ধর, পদ্মশ্রী প্রহ্লাদ রায় আগরওয়াল, কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর মীনা দেবী পুরোহিত, জ্যোতিষাচার্য রাকেশ কুমার পাণ্ড্যে, আয়ুর্বেদাচার্য রাধেশ্যাম শ্রীবাস্তব, বিশিষ্ট উদ্যোগপতি রাধেশ্যাম গোয়েঙ্কা, অশোক তোদী, সজ্জন বনসল, সুধীর জালান, বিশিষ্ট সাংবাদিক কৌশল কিশোর ত্রিবেদী প্রমুখ। এদিন স্বাগত ভাষণ দান করেন অনুষ্ঠানটির অন্যতম আয়োজক শ্রীমতী শান্তা সারদা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, স্বামী গোবিন্দ দেব গিরি মহারাজ ও অশ্বিনী কুমার উপাধ্যায়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মহাবীর প্রসাদ রাওয়াত। অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন— দামোদর প্রসাদ ভট্টড়, সুভাষ মুরারকা, আদিত্য মূন্ধড়া, রমেশ খণ্ডেলওয়াল প্রমুখ বিশিষ্ট কার্যকর্তা।

Anand's

Retailer, Supplier & Vendor(T&C)

Unfold the
Joy of Reading

Deals in

CBSE, WB Board, Competitive, Engineering
B.ED , General ,Others Books & Stationery

Add:- 9, G. C. Mitra Road (Hutton Road), Asansol-1

For More Details Contact Us :
Office:- 0341 405 8778
Sonu Anand: 9002006022, 9434892114
Email :- asansolanand@gmail.com

অম্বুবাচী ব্রত : মাহাত্ম্য ও দর্শন

সরোজ চক্রবর্তী

সনাতন হিন্দুধর্মে অম্বুবাচী ব্রতের গভীরতা কেবল সাধারণ লোক বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর পিছনে রয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান, তন্ত্রশাস্ত্র, যোগ সাধনা, কৃষিবিজ্ঞান এবং পৌরাণিক ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব সমন্বয়। অম্বুবাচী ব্রতের মূল মাহাত্ম্য হলো নারী জাতি ও ধরিত্রী তথা পৃথিবীমাতার উর্বরতা ও সৃজনী শক্তির উদ্‌যাপন। হিন্দু শাস্ত্র ও লোক বিশ্বাস অনুযায়ী আষাঢ় মাসে ধরিত্রীমাতা ঋতুমতী বা রজস্বলা হন। যেভাবে একজন নারী ঋতুচক্রের পর সন্তান ধারণের ক্ষমতা লাভ করেন, ঠিক তেমনি এই সময়ের পর ধরিত্রী মাতা নব রূপে শস্য শ্যামলা ও বীজ ধারণের উপযোগী হয়ে ওঠে।

অম্বুবাচী শব্দের মধ্যে অম্বু ও বাচী এই দুই শব্দ রয়েছে। এখানে অম্বু শব্দের অর্থ জল বা পবিত্র তরল এবং বাচী শব্দের অর্থ প্রস্ফুটিত হওয়া বা বৃদ্ধি পাওয়া। অর্থাৎ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের পর বর্ষার জলের স্পর্শে পৃথিবীর বুকে যে নতুন প্রাণের সঞ্চার ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটে, তাকেই আধ্যাত্মিক ভাষায় অম্বুবাচী বলা হয়। এটি মহাজাগতিক পুরুষ শক্তি (সূর্যের উত্তাপ) এবং নারী শক্তির (পৃথিবীর জল ও উর্বরতা) মিলনকাল হিসেবে তন্ত্রশাস্ত্রে গণ্য হয়। তাই অম্বুবাচী এই ব্রতের মাধ্যমে মহাজাগতিক ভারসাম্য রক্ষিত হয়। অম্বুবাচী পুরাণ ও তন্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত সতীর দেহত্যাগের সঙ্গে যুক্ত। দেবাদিদেব মহাদেব যখন দেবী সতীর মরদেহ নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেন, তখন শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে দেবীর দেহ ৫১টি খণ্ডে বিভক্ত হয়। অসমের নীলকণ্ঠ পাহাড়ে দেবীর যোনিমণ্ডল পতিত হয়। যা আজ কামাখ্যা দেবীর মহাপীঠ নামে খ্যাত। কামাখ্যা মন্দিরে দেবীর কোনো অবয়ব বা মূর্তি নেই। সেখানে একটি যোনি আকৃতির প্রাকৃতিক পাথর রয়েছে, যার উপর দিয়ে একটি ভূগর্ভস্থ জলধারা বা ঝরনা প্রবাহিত হয়। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, অম্বুবাচীর তিন দিন দেবীর ঋতুস্রাবের কারণে সেই পাহাড়ি ঝরনা ও সংলগ্ন ব্রহ্মপুত্র নদের জল রক্তিম বা লালবর্ণ ধারণ করে।

অম্বুবাচীর তিন দিন প্রকৃতি ও শক্তির আরাধনায় কিছু বিশেষ নিয়ম ও নিষেধ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মেনে চলা হয়। এই সময় করণীয় নিয়মগুলি হলো :

১. গুরু মন্ত্র জপ বা নাম সংকীর্তন এই সময় করা যাবে কিন্তু মূর্তি স্পর্শ করা, পূজা বা আরতি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ২. দেবীর ছবি বা ঘট লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। মাটি খোঁড়া, লাঙ্গল চালানো বা গাছে হাত দেওয়া নিষেধ। ৩. ফলার, ফলমূল-সহ আগের দিনে রান্না করা ঠাণ্ডা খাবার এই সময় খেতে হয়। এই তিন দিন উনান জড়ানো, নতুন করে রান্না করা গরম খাবার খাওয়া নিষিদ্ধ। ৪. চতুর্থ দিনে ঘরদুয়ার ও ঠাকুরঘর ভালো করে ধুয়ে শুদ্ধ করা হয়। বিবাহ, গৃহপ্রবেশের মতো মাঙ্গলিক কাজ এই তিন দিন করা যায় না।

অম্বুবাচী নিবৃত্তির পর অর্থাৎ চতুর্থ দিন কামাখ্যা দেবীর অঙ্গ ধৌত করে যে স্নানের জল পাওয়া যায়, তা চরণামৃত হিসেবে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করা হয়। এছাড়া তিন দিন

যোগ ও তন্ত্র সাধনায় অম্বুবাচীর তিনদিনকে সাধকেরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। এই তিন দিন বাহ্যিক জগৎ থেকে মনকে গুটিয়ে নিয়ে অন্তর্মুখী করার বিধান রয়েছে। মানবদেহের মেরুদণ্ডের মূলে অবস্থিত মূলাধার চক্র হলো মানুষের ভিতরের সুপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তির অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর উৎস। যার প্রতীকী রূপ হলো কামাখ্যার যোনিপীঠ।

দেবীর যোনিপীঠ যে লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল, সেই রক্ত বস্ত্র বা অঙ্গবস্ত্র টুকরো টুকরো করে ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তান্ত্রিক ও সনাতন বিশ্বাসীদের মতে, এই রক্তবস্ত্র ধারণ করলে সমস্ত প্রকার নেতিবাচক শক্তি ও রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতে নারীর ঋতুচক্রের মতো অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে লজ্জার বিষয় না ভেবে সৃষ্টির মূল শক্তি হিসেবে সম্মান জানানো হতো। এই ব্রত তার উজ্জ্বল প্রমাণ। এই ব্রত পালনের মাধ্যমে সনাতন হিন্দুধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে, নারীত্ব ও ধরিত্রীর উর্বরতা ছাড়া মহাবিশ্বে প্রাণের উদ্‌গম অসম্ভব।

অম্বুবাচীর এই তিন দিন ধরিত্রী মাতাকে পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া হয়। তাই জমিতে হাল চাষ করা, খনন করা, নিড়ানি দেওয়া বা বীজ বপন করার মতো সমস্ত ধরনের কৃষিকাজ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহের পর বর্ষার শুরুতে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পৃথিবী সিক্ত হয়ে উর্বর হয়ে ওঠে। ওড়িশায় এই উৎসবটি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে 'রজ উৎসব' বা 'রজ পর্ব' হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়।

অম্বুবাচীর তিনদিন সমস্ত প্রকার শুভ বা মাঙ্গলিক কাজ এবং দেব-দেবীর নিত্য পূজা ও মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে। গ্রামগঞ্জের বিধবা মহিলারা এবং সন্ন্যাসীরা এই ব্রত কঠোরভাবে পালন করেন। তাঁরা এই দিনগুলিতে আগুনে রান্না করা গরম খাবার খান না। বরং ফলমূল ও আগের দিন রেঁধে রাখা বা ঠাণ্ডা খাবার ও ফল ভক্ষণ করেন। গৃহস্থ পরিবারেও এই সময়ে সাধারণত আমিষ আহার বর্জন করে সাত্ত্বিক জীবন যাপনের নিয়ম পালন করা হয়ে থাকে। এখানে নারীর এই স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে অপবিত্র না ভেবে তাকে জগৎ সৃষ্টির আদি উৎস এবং ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করা হয়।

জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী, সূর্য যখন মিথুন রাশিতে প্রবেশ করে এবং মৃগশিরা নক্ষত্রের তিনটি পদ শেষ করে চতুর্থ পদে পা রাখে। ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে অম্বুবাচী প্রবৃত্তি শুরু হয়। সূর্য আর্দ্রা নক্ষত্রে প্রবেশ করলে এই যোগ পূর্ণতা পায়। অম্বুবাচী প্রবৃত্তি থেকে ব্রতের শুরু। এই মুহূর্ত থেকে পৃথিবী ঋতুমতী হয় এবং তিন দিন অর্থাৎ ৭২ ঘণ্টা পর সূর্য পরবর্তী অবস্থানে গেলে অম্বুবাচী নিবৃত্তি বা অম্বুবাচী শেষ হয়।

যোগ ও তন্ত্র সাধনায় অম্বুবাচীর তিনদিনকে সাধকেরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। এই তিন দিন বাহ্যিক জগৎ থেকে মনকে গুটিয়ে নিয়ে অন্তর্মুখী করার বিধান রয়েছে। মানবদেহের মেরুদণ্ডের মূলে অবস্থিত মূলাধার চক্র হলো মানুষের ভিতরের সুপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তির অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর উৎস। যার প্রতীকী রূপ হলো কামাখ্যার যোনিপীঠ।

বেদান্ত যাকে নিরাকার নির্বিকার ব্রহ্ম বা পরম চেতনা বলে, তন্ত্রশাস্ত্র তাকে শিব বা পরমপুরুষ হিসেবে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু এই নিষ্ক্রিয় পরম চেতনা তখনই সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠে, যখন তার সঙ্গে যুক্ত হয় আদ্যাশক্তি বা মহাজাগতিক নারীশক্তি। অম্বুবাচী হলো সেই আদ্যাশক্তির বাৎসরিক সৃজনী স্পন্দনের প্রতীক। যেভাবে মায়ের জঠরে নতুন প্রাণের জন্ম হয়, ঠিক তেমনি অম্বুবাচীর সময়ে এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের মূল চালিকা শক্তি বা ধরিত্রীমাতা নিজেকে নতুন সৃষ্টি ধারণের জন্য প্রস্তুত করেন। আধ্যাত্মিক স্তরে এটি ঈশ্বরের প্রতি পরম কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মুহূর্ত। সনাতন আধ্যাত্মিক দর্শন 'পবিত্র বনাম অপবিত্র' এই দ্বৈততার ঊর্ধ্বে উঠে এক পরম অদ্বৈত বোধের শিক্ষা দেয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় 'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ'-এ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই সত্তার কথা বলেছেন। প্রকৃতির মাধ্যমে পরম পুরুষ নিজেকে দৃষ্টিতে ব্যক্ত করেন। অম্বুবাচী হলো প্রকৃতির সেই সক্রিয় ও সৃজনশীল রূপের সর্বোচ্চ পর্যায়। প্রকৃতি যখন ঋতুমতী হয়, তখন তিনি পুরুষ বা পরম চেতনার বীজ ধারণ করে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শস্য শ্যামলা ও প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য প্রস্তুত হয়।

অম্বুবাচীর এই তিন দিন অর্থাৎ ৭২ ঘণ্টা মহাজাগতিক শক্তি বা পিঙ্গলা ও ঈড়া নাড়ী এক বিশেষ ভারসাম্য আসে। এই সময় শক্তি বহির্মুখী থেকে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী হয়ে যায়। সাধকেরা এই সময়ে তাদের সুগত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগিয়ে তুলে মূলাধার চক্র থেকে উপরের দিকে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর হয়ে সহস্রারের দিকে চালিত করার জন্য ধ্যান ও জপ করেন। প্রকৃতির এই ঋতুকাল এলে সাধকের আত্মিক জাগরণের মহত্তম সময়। বাহ্যিক কামাখ্যা মন্দির বা পৃথিবীর ঋতুচক্র হলো একটি প্রতীক মাত্র। আসল দর্শন ও সত্য লুকিয়ে আছে শরীরের ভিতরে। অম্বুবাচী ব্রত মনে করিয়ে দেয় জগতের সৃষ্টি যেমন নারীর জঠর থেকে, তেমনি আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্ম ভিতরের এই সুপ্ত মাতৃশক্তি বা কুণ্ডলিনীর জাগরণের মাধ্যমে সম্ভব হয়। এটি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক আত্মশুদ্ধি ও পুনর্নবীকরণের একটি সময়। তাই সনাতন ধর্মে অম্বুবাচী ব্রতের মাহাত্ম্য নিছক কোনো ধর্মীয় আচার বা লোকাচার নয়, আধুনিক নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা এবং তন্ত্র শাস্ত্রের নারীসত্ত্বা এবং পুরুষ তথা পরম চেতনার মিলন। সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য এবং মানুষের অন্তর্জাগৃতির এক নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সাধনা।

তথ্যসূত্র :

১. কালিকাপুরাণ (১০ম-১১শ শতাব্দী)।
২. যোগিনী তন্ত্র।
৩. দেবীভাগবত পুরাণ (চতুর্থ স্কন্ধ)।
৪. শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।
৫. সূর্যসিদ্ধান্ত।
৬. বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত ও গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা।
৭. রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের 'অষ্টবিংশতি তত্ত্ব' ও 'স্মৃতিতত্ত্ব'।

(লেখক সাংবাদিক ও গবেষক)

মালদার গৌড়ে

গৌড়েশ্বরীতলা ও শ্রীরাম মন্দির

প্রবীর কুমার রায়

বঙ্গের পুরনো জনপদ গৌড়। বহু ঘটনার সাক্ষী এই গৌড় নগরী। শশাঙ্ক থেকে দেশভাগ। উল্লেখ্য বড়ো সোনা মসজিদ এপারে তো ছোটো সোনা মসজিদ ওপারে। কত রাজা, সুলতান, রানি, নর্তকী শ্রীচৈতন্যদেব, রূপ, সনাতন কত মন্দির মসজিদের সাক্ষী গঙ্গার পূর্ব পাড় এই গৌড় নগর। গঙ্গা সরে গেছে পশ্চিমে বহু দূরে রয়ে গেছে তার খাত 'ভাগীরথী' নামে। যা আজ ক্ষীণস্রোতা, বহু ঘটনার সাক্ষী এই ভাগীরথী। যার শীতল বারিতে স্নিগ্ধ হতেন রাজা রানি রাজকুমারী সেনাপতি আরও কত না কেউ। এই নদীপথে নদের নিমাই শ্রীচৈতন্য দেব রূপে পদধুলি দিয়েছিলেন এই গৌড়ের হাবাস খানের ঘাটে জ্যৈষ্ঠমাসের পুণ্য সংক্রান্তিতে। আবার রূপ ও সনাতনকে নিয়ে বৃন্দাবনে ফিরে গিয়েছিলেন এই ঘাট দিয়েই।

আজও মৃতপ্রায় ভাগীরথীর বুকে কোনোক্রমে টিকে আছে এই পুণ্যতোয়া ঘাট। আগে ইটের কিছু ধ্বংসাবশেষ ছিল কিন্তু বর্তমানে কিছুই নেই। এখানে নেই কোনো ফলক, নেই কোনো ঘাটের পরিচিতি। বর্তমান গৌড় অর্থাৎ রামকেলির ঠাকুরবাড়ি থেকে এই ঘাটের দূরত্ব মেরে কেটে দু-আড়াই কিলোমিটার। ঈশ্বরতুল্য শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতিবিজড়িত এই ঘাটে রামকেলি মেলার সময় বহু পুণ্যার্থী স্নান করেন। অনেকটা যেন 'মকরের' স্নান। এখানে নেই কোনো স্নানের জন্য ভদ্রস্থ ব্যবস্থা। কতিপয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অর্থানুকুল্যে একটি মন্দির গড়ে উঠেছে তবে অর্থাভাবে পুরো কাজ এখনো শেষ হয়নি। কিংবদন্তী যে, এই নদীতে স্নানের পথে সিপাহশালার ব্রাহ্মণ সন্তান কালাচাঁদ রায়কে দেখে সুলতান সুলেমান কাররানির কন্যা দুলারী ভালোবেসে ফেলেন। পরবর্তীতে ইনি সুলতানের প্রধান সেনাধ্যক্ষ হন ও গোঁড়া হিন্দুদের জন্য রূপান্তরিত হয় বঙ্গের ইতিহাসে কালাপাহাড় নামে। সে ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছে পুরীর জগন্নাথ মন্দির, কামাক্ষা-সহ মেদিনীপুরের বর্গভীমা মন্দির ধ্বংসের সাক্ষী হিসেবে। তাই তো সে বাতসিকান।

গৌড়ের সুলতানি আমলের আরও ২০০ বছর আগে বঙ্গের রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন। বঙ্গের হিন্দু সমাজে এত জনবিন্যাসের সৃষ্টি ওই আমলে। 'কুলীন' শব্দটির ব্যবহার সম্ভবত প্রথম হয়েছিল সেন যুগে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে সেন রাজাদের আরাধ্য দেবতা ছিলেন 'কমলাদেবী'। সেখান থেকে হয়তো কমলাবাড়ি (যেখানে দক্ষিণ দিক থেকে মালদা যাওয়ার পথে বর্তমান বাইপাসের শুরু) নামের উৎপত্তি। এই কমলাদেবীর মন্দির কোথায় ছিল তার কোনো প্রামাণিক তথ্য ঐতিহাসিকদের কাছে নেই। তবে তাঁরা অনুমান করেন বর্তমানে কমলাবাড়ি গ্রাম বা সাদুল্লাপুর এলাকাতে গঙ্গানদীর ধারে এই মন্দিরের অবস্থান ছিল। এই মন্দির হয়তো মুসলমান শাসকদের দ্বারা অথবা গঙ্গার প্লাবনে ধ্বংসপ্রাপ্ত। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, পরে এই দেবী রূপান্তরিত হন 'গৌড়েশ্বরী' নামে। রাজধানী সরে আসে আরও পূর্বদিকে। তারপর বঙ্গে ইসলামি শাসন শুরু হয়। তখন গৌড়েশ্বরী মন্দিরের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা

পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধের পরে মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্গতির জন্য যে ক্রিয়া কর্মাদি করে থাকেন তাকে পিণ্ডদান বলা হয়। ভারতের বিহার রাজ্যের গয়াধামে বিষ্ণু পাদ মন্দিরে ফল্গুনদীর তীরে এই ক্রিয়াটি হয়ে থাকে। এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই প্রথা চালু আছে। সেই সময় রাস্তা-বিপদসংকুল হওয়ায় বঙ্গ-সহ পূর্ব ভারতের মানুষ সেন রাজাদের আনুকূল্যে গঙ্গাতীরে গৌড়েশ্বরীতলায় পিণ্ডদান প্রথা চালু করেন। পরবর্তীতে সুলতানি আমলেও এই প্রথার ছেদ পড়েনি। তবে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানের পরিবর্তন হয়। সুলতান হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) সময় শ্রীচৈতন্যদেবের আগমনের পরে গৌড়ের মাহাত্ম্য আরও বৃদ্ধি পায় এবং ভারতবর্ষে বৈষ্ণব মতের উদ্ভব ঘটে। ১৫৭৬ সালে বঙ্গ দিল্লির দখলে এলে গৌড়ের গরিমা হ্রাস পেতে থাকে এবং গৌড় মৃত নগরীতে পরিণত হয়। বঙ্গের রাজধানী স্থানান্তরিত হয় ঢাকা শহরে। বর্তমানে যে স্থানে পিণ্ডদান হয়ে থাকে তা সুলতানি আমলের নয়। কারণ বর্তমান স্থানটি গৌড়ের রাজপ্রাসাদ থেকে মাত্র ৫০০ মিটার পূর্বদিকে ও ফিরোজ মিনার থেকে মাত্র ২০০ মিটার পশ্চিমে অবস্থিত। ইসলামিক শাসনে রাজপ্রাসাদের থেকে এত কাছে পিণ্ডদান স্থল কখনোই সম্ভব নয়। তবে কীভাবে এই স্থানে পিণ্ডদান প্রথা চালু হলো বা মেয়েরাই কেবল পিণ্ডদানের অধিকারী হলো এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকরা নীরব। তবে গৌড় ধ্বংসের পরে ব্রিটিশ শাসনকালে সম্ভবত এই স্থান নির্বাচিত হতে পারে। পিণ্ডদানের পরে ফিরোজ মিনারের উপরে তুলসী মন্দির মনে করে মাটির প্রদীপ জ্বালানোর প্রথা চালু ছিল যা অনেকে প্রত্যক্ষ করেছে। বর্তমানে মিনারে ওঠা নিষিদ্ধ তাই মিনারের পাদদেশে ও বর্তমান মন্দিরের ছাদে মন্দির চূড়ার চারপাশে প্রদীপ জ্বালানোর প্রথা আছে। আগে পিণ্ডদান স্থলে জামগাছের তলায় শিলা খণ্ড ও কালো পাথরের কালিকা দেবীর মূর্তির নীচে রামকেলি মেলার দিন জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে এই মাঙ্গলিক কাজ মহিলারা করতেন। সেই সময় বংশ-পরম্পরায় পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করতেন মালদা জেলার মধুঘাট নিবাসী নিবারণ ঝা এবং নরসুন্দরের দায়িত্ব পালন করতেন কদমতলা নিবাসী ভুবনমোহন সরকার (বারিক)-এর পরিবার। কলেরব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কয়েক দশক আগে কমিটি তৈরি হয়েছে এবং পরিবার তন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটেছে।

কয়েক বছর আগে ওই স্থলে পাকা মন্দির নির্মাণ হয়েছে। একটিতে অবস্থান করছে গৌরীপট্ট-সহ শিবলিঙ্গ, পাশের ঘরে সেই কালিকা দেবী মূর্তি। গৌরী পট্টের সামনে পিণ্ড দান হয়ে থাকে এবং পাশে বৈতরণী পারের জন্য একটি সিমেন্ট বাঁধানো নদীর মতো গর্ত করা আছে। গঙ্গা পূজা অর্থাৎ দশেরা দিন থেকে রামকেলি মেলা অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি পর্যন্ত এই পিণ্ডদান প্রথা আগে চালু ছিল। বর্তমানে কমিটিকে জানিয়ে যে কোনো দিন নারী-পুরুষ এখানে পিণ্ডদান করতে পারেন। সম্পূর্ণ ব্যবস্থা মন্দির কমিটি করে থাকে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বা পুরাণে এই জায়গার উল্লেখ আছে কিনা জানা নেই তবে প্রচলিত মত হলো ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে এই গৌড়ে অবস্থান করেছিলেন। এই সময় সীতাদেবী তার মাতৃকুল উদ্ধারের জন্য এই স্থলে পিণ্ডদান করেছিলেন। তাই মাতৃজ্ঞানে মহিলারাই এই স্থলে পিণ্ডদানের অধিকারিণী।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেদিন অযোধ্যায় শ্রীরাম মন্দিরের উদ্বোধন হয় (২২ জানুয়ারি, ২০২৪) সেদিনই এই মন্দির চত্বরের উত্তরে শ্রীরামমন্দিরের শিলান্যাস হয় এবং পরের বছর ঠিক একই দিনে (২২.০১.২৫) ৪ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট অষ্টধাতুর শ্রীরামমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক পরের বছর ২২.০১.২৬ সাড়ে তিন ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট সীতাদেবীর অষ্ট ধাতুরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে মন্দির পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ◻

উগ্র প্রাদেশিকতা ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংহতির পরিপন্থী

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলে দেশবাসী খানিকটা আশ্বস্তবোধ করতে পারেন এই ভেবে যে, পশ্চিমবঙ্গ কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলোপের পূর্বাবস্থায় চলে যায়নি।

খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

১৯৪৭ সালে ভারতমাতার সর্বশেষ অঙ্গচ্ছেদনের পরে অধুনা ভারতবর্ষ ২৮টি রাজ্য এবং ১টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (Union Territories) নিয়ে গঠিত। এই সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমূহের ভাষা, কৃষ্টি বা সংস্কৃতি এবং ভিন্ন প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভারতীয় জাতীয়তাবোধ এদের একসূত্রে গ্রথিত করেছে। এই সেতু বন্ধনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত রয়েছে হাজার হাজার বছরের ভারতীয় সংস্কৃতি এই সমাজ বিবর্তনের মধ্যে। অতীতের শত-সহস্র বছর ধরে বিদেশি ও বিজাতীয় শাসন,শোষণ ও ধর্মান্তরণ ভারতীয় জাতিসত্তাকে সাময়িক ভাবে মলিন করলেও তা পুনরায় ফিনিক্স পাখির মতো পুনর্জীবিত হয়ে স্বমহিমায় ভাস্বর হয়েছে ভারতীয় সভ্যতা।

১০২৬ সাল থেকে গুজরাটের সোমনাথ মন্দির বার বার লুঠ, ধ্বংস ও অপবিত্র করেছে গজনির মামুদ। তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১২৯১ সালে আলাউদ্দিন খিলজি, ১৩৯৫ খ্রিস্টাব্দে জাফর খান, ১৪৫১ সালে মুহম্মদ বোনা এবং ১৬৬৫ সালে মুগল বাদশা ঔরঙ্গজেব সম্পূর্ণভাবে ধূলিসাৎ করে দেয় গুজরাটের সোমনাথ মন্দির। স্বাধীনতার পরে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের চেষ্টায় মন্দির ট্রাস্ট কমিটির মাধ্যমে বর্তমান অবয়বে মন্দিরটি ফিরে আসার পরে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ ১৯৫১ সালের ১১ মে মন্দিরটির দ্বার উদ্ঘাটন করেন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর আপত্তি সত্ত্বেও।

নেহরুর আপত্তির কারণ ছিল এতে নাকি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হবে যদিও ভারতের মুসলমানরা তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেননি। রাষ্ট্রপতি মন্দিরে যাবেন না এ ধরনের কুযুক্তি রাজেন্দ্রপ্রসাদ মেনে নেননি যেমন কংগ্রেসের সমালোচনা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী মোদী রামমন্দির উদ্বোধন থেকে পিছিয়ে আসেননি। ভারতের পঞ্চম রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ রাষ্ট্রপতি ভবনে নিয়মিত নমাজ পড়তেন ,তাতে কি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা কলুষিত হয়েছে— এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। ব্যক্তিগত ধর্মাচারণে, মন্দির উদ্বোধনে ধর্মনিরপেক্ষতা খর্ব হয় এটি এক ধরনের বিভেদমূলক প্রচার, যার জনক জওহরলাল নেহরু। এর সূত্র ধরেই পরবর্তী ভারতবর্ষে তোষণ ও ভোটব্যাংকের রাজনীতি চালু হয় যার পরিণামে দেশে জেহাদি শক্তির বাড়বাড়ন্ত হয়। অথচ, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি পরিচালিত সরকার প্রতিষ্ঠা এবং আইনের শাসন বলবৎ হওয়ায় রাস্তা জুড়ে ইদের নমাজ এবং প্রকাশ্য স্থানে গোহত্যার নিষেধাজ্ঞা যা প্রাথমিক অসন্তোষ ও আপত্তির পরেও মুসলমান সম্প্রদায় বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছে। অনুরূপভাবে ভবিষ্যতে মন্দিরের রাস্তায় শান্তিপূর্ণ মহরমের জৌলুস যাবে— আবার মসজিদের পাশ দিয়ে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা যাবে তবেই তো প্রকৃত সম্প্রীতি কায়েম হবে। এতে অবশ্য হিন্দু-মুসলমান বিভেদ সৃষ্টি করে ভোটব্যাংক রাজনীতির কারবারিদের সমূহ ক্ষতি , তবে লাভবান হবে সম্প্রীতি এবং জাতিতে জাতিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। অনুরূপভাবে ভারতের জাতীয় গান (National Song) বন্দে মাতরম্ মাদ্রাসা-সহ সমস্ত স্কুলে ১ জুন থেকে গাওয়া হচ্ছে— বিনা আপত্তিতে, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলির মূলস্রোতে যোগদান শিক্ষার ক্ষেত্রে মাদ্রাসা এবং অন্য স্কুলের মধ্যে বিভেদ কমাবে।

গত পাঁচ দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এবং পরবর্তী তৃণমূল সরকার মুসলমান ভোটব্যাংক সুসংহত করতে পশ্চাদপদ মুসলমানদের অপরাধমূলক কাজে প্রশ্রয় দিয়েছে আইনি ব্যবস্থা না নিয়ে, বরং প্ররোচিত করেছে বিনা বাধায় রাজনৈতিক হানাহানি, পুলিশকে আক্রমণ, এমনকী হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করতে উৎসাহিত করে। ফলে নানা জায়গায় শাজাহান, জাহাঙ্গির, আরাবুল, শওকত মোল্লার মতো কিছু জায়গিরদার তৈরি হলেও বাকি ৪ কোটি সাধারণ মুসলমানের তাতে কী লাভ হয়েছে প্রতিবেশী হিন্দুদের সঙ্গে বৈরিতা বৃদ্ধি ছাড়া?

বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশি মুসলমান এবং মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমান অনুপ্রবেশের ফলে পশ্চিমবঙ্গ-সহ সীমান্ত রাজ্যগুলির জনবিন্যাসের ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংকট

ফঃ ৫

তৈরি হয়েছে। এই অনুপ্রবেশের ফলে পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থান ও আর্থিক ব্যবস্থায় যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে তার প্রভাব শুধু এরাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদেরই উপর নয়, ভারতীয় মুসলমানদেরও বহন করতে হচ্ছে। একমাত্র মোল্লাবাদী, জেহাদি মুসলমান যারা পশ্চিমবঙ্গকে দার-উল-হার্ব থেকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করার খোয়াব দেখেন, তারা ছাড়া অন্যদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সরব হওয়া দরকার। একথা স্বীকার্য যে, অনেক ভারতীয় নাগরিকের এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম বাদ গিয়েছে যান্ত্রিক ও মানবিক (Human and technical error) ভুলের জন্য। মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের নাম বেশি বাদ যাওয়ার কারণ, ওই জেলায় ৭০ শতাংশ মুসলমান জনগোষ্ঠীর বাস। এই নিবন্ধকারের গ্রামের বাড়ির পাশে একটি বুথে ৪০২ জনের নাম বাদ পড়েছে। এরা সবাই হিন্দু। হয়তো এআই বা ডেটা এন্ট্রি অপারেটর এজন্য দায়ী হবে, তাই বলে এর সংশোধনের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল এমনটা নয়। তবে কেন্দ্র এবং নির্বাচন কমিশন ভোটার লিস্ট বিদেশিশূন্য করার যে প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে তা স্বাগত। শরণার্থী হিন্দুদের নাম নানা কারণে ভোটার লিস্ট থেকে বাদ পড়েছে, তাদের উচিত হবে অনতিবিলম্বে সিএএ-তে আবেদন করা সেক্ষেত্রে তাঁরা যেমন সরকারি অনুদান প্রকল্পগুলির সাহায্য পাবেন, তেমনি ভবিষ্যতে কোনোদিন এনআরসি (National Register of Citizens) বা জাতীয় নাগরিকপঞ্জীর কাজ শুরু হলে সিএএ-এর মাধ্যমে নাগরিকত্ব লাভ— বর্ম হিসাবে কাজ করবে।

ভারতের সরকারি ভাষা হিন্দি বা ইংরেজি হলেও, ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে এমনকী অঞ্চল ভিত্তিক জাতিগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতিকে মর্যাদা দানের জন্য তাদের ভাষা ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফশিলে স্বীকৃত এবং প্রত্যেকটি জাতি-উপজাতির মানুষের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ ও সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে, যাতে কারুর মনে না হয় ভাষা-সংস্কৃতিগতভাবে তারা বঞ্চিত। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং ঐক্যের স্বার্থে একটি অভিন্ন রাষ্ট্রীয় পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীত রয়েছে, যে রীতি পৃথিবীর যেকোনো সার্বভৌম দেশ প্রচলিত দেশবাসীর আনুগত্য প্রকাশে, ধর্ম-সংস্কৃতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও।

অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি সার্বভৌম দেশে একটি জাতীয় স্লোগান বা ধ্বনি এবং সরকারি প্রতীক (Emblem) থাকে যা ভারতের ক্ষেত্রে জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম্ এবং অশোক স্তম্ভ। কেউ যদি বলেন আমার রাজ্যে আলাদা রাজ্য সঙ্গীত, আলাদা প্রতীক, আলাদা পতাকা থাকবে তখন ধরেই নিতে হবে নিশ্চয় কিছু অভিসন্ধি আছে।

একথা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তার শাসনে রাজ্য সঙ্গীত চালু করেছিলেন, রাজ্যের আলাদা প্রতীক বিশ্ব বাংলা (ব) প্রবর্তন করেছিলেন এবং বিদেশি স্লোগান 'জয় বাংলা'কে তৃণমূল দলের ধ্বনি বা স্লোগান হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিটি ভারতের মুক্তি আন্দোলনে বিপ্লবীদের স্বাধীনতার যূপকাষ্ঠে নিঃশেষে প্রাণ দান করতে অনুপ্রাণিত করেছে— যেমনটা 'জয় বাংলা' ধ্বনিটি অধুনা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেরণাদায়ক ছিল। আমাদের প্রতিবেশী দেশের জাতীয় ধ্বনি 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', নেপালে 'জয় নেপাল' এবং শ্রীলঙ্কায় 'জয় ইওয়া'— এগুলি তাদের অনুপ্রেরণার স্থল, যেমন ভারতের 'জয় হিন্দ', 'বন্দে মাতরম্'। তাহলে আমরা কেন বিজাতীয় 'জয় বাংলা'কে আমাদের প্রেরণার উৎস হিসাবে গ্রহণ করবো? এই প্রেরণা বা প্ররোচনার পিছনে নিশ্চয় বড়ো কোনো চক্রান্ত ছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

পাকিস্তান বা বাংলাদেশে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক দল 'জয় হিন্দ' বা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিলে তার অবস্থা দীপু দাসের (জীবন্ত পুড়িয়ে মারা) মতো হতে এক ঘণ্টা সময়ও লাগবে না। সুতরাং রাষ্ট্রহিতে এখনি 'জয় বাংলা' স্লোগানটিকে ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলে দেশবাসী খানিকটা আশ্বস্তবোধ করতে পারেন এই ভেবে যে, পশ্চিমবঙ্গ কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলোপের পূর্বাবস্থায় চলে যায়নি। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বাধা দান, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের জন্য জমি অধিগ্রহণ না করা, দুর্নীতির তদন্তে আসা ইডি-সিবিআই অফিসারদের উপর আক্রমণ ও রাজ্যের অসহযোগিতা, এমনকী দেশের প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বহিরাগত বলে দাগিয়ে দেওয়ার পিছনে ছিল আঞ্চলিক রাজনীতির আড়ালে দেশবিরোধিতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র। দেশের অখণ্ডতা ও সমৃদ্ধির স্বার্থে ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রবণতাকে সরকার কঠোরভাবে দমন করবে এটাই প্রত্যাশা। এতে সামান্যতম বিচ্যুতি দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি বিপন্ন করতে পারে।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য প্রবন্ধক)

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর হাদি নাটকটাও জমলো না

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। বাংলাদেশের একজন শীর্ষ জঙ্গি সন্ত্রাসীকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে রাজনীতির ‘একটি আলোচিত বড়ো চরিত্র’ করে তুললেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। কার্যত জঙ্গি আন্দোলনের মুখে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামি লিগ সরকারের পতন এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ভারতে পৌঁছে দেওয়ার পর ‘জেন-জি’ নামটাকেই অপমানিত করে যে জঙ্গি ছাত্র সন্ত্রাসীরা রাজনীতির সামনে এসে দাঁড়ায় তাদের অন্যতম ওসমান হাদি। অন্য নেতাদের মতো এই হাদিও ভয়ংকর রকমে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পাকিস্তানের ভাঙন মেনে নিতে পারেনি। কথায় কথায় ভারতের বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়ত, ভারতের সেভেন সিস্টারস স্বাধীন করার ঘোষণা দিত, পশ্চিমবঙ্গকে আলাদা করে বাংলাদেশ-সহ একটি স্বাধীন দেশ গঠন করার কথা সগর্বে ঘোষণা করতো, নোংরা অশালীন ভাষায় শেখ মুজিব ও আওয়ামি লিগ নেতাদের গালাগাল দিতো এই জেহাদি জঙ্গি। মুজিব ও আওয়ামি লিগ নেতাদের প্রতি আক্রোশের কারণ তারা পাকিস্তান ভেঙেছেন।

অন্য ছাত্র-জঙ্গিদের মতো ওসমান হাদিও বাংলাদেশকে শুধু পরিপূর্ণ শরিয়াভিত্তিক ইসলামি দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা নয়, পাকিস্তানের হারিয়ে যাওয়া ভাই বাংলাদেশকে দিয়ে ভারতকে ব্যস্ত রাখার কৌশলগত অবস্থানে পরিণত করার সংকল্পও ঘোষণা করতো। স্বপ্ন দেখতো একদিন মুসলমানরা মিছিল করে সীমান্ত

অতিক্রম করবে এবং ভারতের মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে দিল্লি দখল করে সেখানে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করবে। জামায়াতে ইসলামির নিজস্ব ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্র শিবির সেই স্বাধীনতাপূর্ব সময় থেকেই জঙ্গিপনায় দক্ষ অত্যন্ত হিংস্র জেহাদি সংগঠন, একাত্তরে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট জঙ্গি অভ্যুত্থান সংগঠিত করতে বিভিন্ন পর্যায়ে ছাত্রদের দীর্ঘদিন ধরে প্রশিক্ষিত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় জামায়াতের অভিভাবকত্বে আরও দুটো জঙ্গি সংগঠন জন্ম নেয়। সংগঠন দুটি হচ্ছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও ইনকিলাব মঞ্চ। ইনকিলাব মঞ্চের প্রধান ছিল ওসমান হাদি। কথিত জুলাই বিপ্লবে বহু হত্যাকাণ্ডে যুক্ত ছিল এই হাদি। সাম্প্রদায়িক উসকানি দিয়ে হিন্দুদের ওপর হামলা, বাড়িঘর ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, দখল ও চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে এই ওসমান হাদি ও ইনকিলাব মঞ্চের নেতাদের বিরুদ্ধে।

জাতীয় নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার পর সেই জঙ্গি হাদির ওপর গুলি চালানো হয় গত বছরে ১২ ডিসেম্বর। গুরুতর আহত হাদিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। হাদি ঢাকা ৮ আসন থেকে ইনকিলাব মঞ্চের প্রার্থী হওয়ার কথা ছিল। গুলির সঙ্গে সঙ্গে ওই আসনে বিএনপি প্রার্থী মির্জা আব্বাসের দিকে অভিযোগের আঙ্গুল উঠলো। অবশ্য রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা একটু গভীরে গিয়ে তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণে ধারণা পেলেন, খেলা হয়েছে অন্য জায়গা থেকে। নির্বাচন যারা আপাতত চাইছিল না তারাই খেলেছে। অর্থাৎ নোবেল শান্তি বিজয়ী ইউনুস। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। কিন্তু খেলা অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। যে আমেরিকান ডিপ স্টেট পাকিস্তানকে সঙ্গে নিয়ে হাসিনাকে বিতাড়িত করেছে, তাদের অনেক কাজ বাকি। প্রথমত ইউনুস খেলা সামলাতে পারছেন না, নাহলে তাকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় রাখার একটা পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি চাইছে না, নির্বাচন যে কোনো মূল্যে করাতেই হবে। হাতে অবশ্য মজুত আছে বিএনপি ও জামায়াত। তাই চিন্তা নেই। কাজ বাকি অনেক। বাণিজ্য চুক্তি দ্রুত সই করতেই হবে। চট্টগ্রাম বন্দর হাতে তুলে দেওয়ার কাজ ইউনুস অনেকটা এগিয়ে রেখেছেন। সে নিয়ে চিন্তা নেই। নির্বাচনে যারাই ক্ষমতায় আসুক তারাই করবে। ছক তৈরি আছে।

ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ড নিয়ে চাপান-উতোর গোড়া থেকেই নানামুখে গতি পেয়েছে। মার্কিন ডিপ স্টেটের পরামর্শে ইউনুস শোকটাকে সরকারি পর্যায়ে নিয়ে গেলেন। ভাবাবেগ তৈরি করতে বর্ণাঢ্য চিত্রনাট্যে জানাজা ও দাফন কাজ সম্পন্ন হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের কাছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের কবর রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারের স্থায়ী

সিদ্ধান্ত ছিল এখানে আর কারও কবর হবে না। শিক্ষাবিদ কবীর চৌধুরী, কবি শামসুর রহমান, সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদ ও সাহিত্যিক-চিত্রপরিচালক হুমায়ুন আহমেদকে এখানে কবর দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই পিছিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সব কিছু পিছনে ফেলে জাতীয় কবি ও শিল্পাচার্যের কবরের পাশে জঙ্গি-সন্ত্রাসী ওসমান হাদির কবর তৈরি হলো অত্যন্ত তড়িঘড়ি করে, একদিকে জাতীয় নাগরিক পার্টি ও ইনকিলাব মঞ্চের অসহিষ্ণু আচরণ এবং অন্যদিকে ইউনুসের মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। বুদ্ধিজীবীদের মতে, ইউনুস নোবেল পাওয়ার পর থেকেই মনে করেন, বাংলাদেশে তার চেয়ে বেশি সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আর কেউ থাকতে পারে না। তাই তিনি জাতীয় কবি ও শিল্পাচার্যকে একজন জঙ্গি সন্ত্রাসীর সমপর্যায়ে নামিয়ে আনতে মদত দিলেন। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামি ছিল এই উদ্যোগের পেছনের শক্তি, কারণ জামায়াত বিদ্রোহী কবি নজরুল ও শিল্পাচার্য জয়নুল দুজনকেই ইসলামি ভাবধারার পরিপন্থী বলে মনে করে। বিএনপি নীরবে জামায়াত ও ইউনুস সরকারের সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়ে গেছে, একারণে যে, নির্বাচনটা যেন কোনো কারণে স্থগিত হয়ে না যায়। আওয়ামি লিগ যেন পুনরুজ্জীবিত হতে না পারে। এই সমীকরণে ওসমান হাদি রূপান্তরিত হয়ে গেল জাতীয় বীরে।

এই ওসমান হাদি এখন ভারতের রাজনীতিতে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হাদি হত্যা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাকে নিশানা করে ধর্মতলায় ২ জুন যে অভিযোগ তুলে নির্বাচনে পরাজয়ের হয়তো প্রতিশোধ নিতে চেয়েছেন, কিন্তু লক্ষ্যভেদ হয়নি। অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার। তারেক রহমানের সরকার মমতার বক্তব্যকে গুরুত্ব দেয়নি। সরকারি দল বিএনপি একে 'পলিটিক্যাল স্টান্টবাজি' এবং একজন পরাজিত নেত্রীর ভিত্তিহীন মন্তব্য বলে আখ্যায়িত করেছে। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ বলেছেন, উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) সদ্য নির্বাচনে হেরে গিয়েছেন। এমন একজন ব্যক্তি বিশেষের কথা নিয়ে সরকারের তরফে প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত হবে না। কী লজ্জা !

অন্যদিকে এমন কিছু অভিযোগ হাদি পরিবারের সদস্যরা হঠাৎ করেই সামনে নিয়ে এসেছেন, তা চমকে দিয়েছে রাজনৈতিক মহলকে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যেদিন অভিযোগের আঙ্গুল তুললেন, সেদিনই ওসমান হাদির ভাই ওমর হাদি লন্ডনে বসে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন 'শহীদ ওসমান হাদি হত্যার প্রেক্ষাপট তৈরিতে জামায়াতের আমিরের একজন পিএস জড়িত। হাদিকে ঢাকা ৮ আসন থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যাপক চাপ দিয়েছে আমাদের।' দ্বিতীয় পোস্টে লিখেছেন, 'হাদি হত্যার আগে ও পরে হাদির সঙ্গে ঠিক কী ঘটেছিল এই বিষয়ে নিরপেক্ষ আলোচনা ও তদন্ত আবশ্যক। তাকে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়েছে এর দায় সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো এড়াতে পারে না।' একই দিন তৃতীয় পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'শহীদ ওসমান হাদির খুনের সাথে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টা এবং বিএনপি সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী সরাসরি জড়িত।' হাদি হত্যাকাণ্ডের পর প্রচণ্ড ক্ষোভের মুখে ইউনুস সরকার ওমর হাদিকে লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে চাকরি দিয়েছিল। তিনি এখনো সেই চাকরিতে বহাল আছেন।

ওমরের পোস্টের ঠিক দুদিন পর তাদের বোন মাসুমা হাদি প্রশ্ন তুলেছেন, শরীফ ওসমান হাদি হত্যা মামলার বাদী ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আবদুল্লাহ আল জাবের কেন ? মাসুমা হাদি ফেসবুকে হাদি হত্যাকাণ্ড সময়ের ঘটনাবলী তুলে ধরে দীর্ঘ পোস্টে মামলার বাদীর স্বাক্ষর নেওয়া নিয়ে তৎকালীন ইউনুস সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। লিখেছেন, 'আমি আমার ভাইয়ের মামলার বাদী নিয়ে কিছু বলতে চাচ্ছিলাম না। কারণ এর চেয়েও অনেক ভয়ংকর ষড়যন্ত্র হয়েছে আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে। সেই বিষয়েও এখন অবধি আমি মুখ খুলিনি। শুধু আমার ভাইয়ের জন্য। আমি মুখ খুললে সবার একটাই প্রশ্ন সামনে আসবে যে, আমার ভাইয়ের আশেপাশে যারা থাকে, তার পরিবারকে নিয়ে এই ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে কীভাবে লিপ্ত হতে পারে। কিন্তু দুদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার ভাইয়ের মামলার বাদী হওয়া নিয়ে যে পরিমাণ নোংরামি হচ্ছে বাধ্য হয়ে আজকে সম্পূর্ণ বিষয়টা পরিষ্কার করলাম।' মাসুমা ওসমান তার ভাই হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার দিনের ঘটনা বর্ণনা করে আরও লিখেছেন, 'আমার ভাই যেদিন গুলিবিদ্ধ হলো, সেই সংবাদ শোনামাত্র আমি ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিই এবং সরাসরি এভারকেয়ার হাসপাতালে চলে যাই। হাসপাতালে যাওয়ার পর থেকে এক মিনিটের জন্য আমি হাসপাতাল ছেড়ে বাসায় যাওয়া তো দূরের কথা শরীফ ওসমান হাদিকে ছেড়ে আমি এক মিনিটের জন্য নীচতলায় পর্যন্ত যাইনি।' তিনি তৎকালীন সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করেন,'এখন আমার প্রশ্ন প্রশাসনের রোক এভারকেয়ারে এসে জাবেরের কাছ থেকে সই নিল কেন? আর আমি উপস্থিত থাকাকালীন জাবের সই দেবে কেন? এ নিয়ে আমি বহুবার প্রশ্ন করেছি। আমাকে বোঝানো হয় যে, ওমরের (ওসমান হাদির ভাই) কাছে নাকি গিয়েছিল, ওমর বলেছে এখন আমরা চিকিৎসা নিয়ে ব্যস্ত। চিকিৎসা সম্পন্ন হলে এই বিষয়গুলো দেখা যাবে।' দীর্ঘ পোস্টে মাসুমা ভাইয়ের চিকিৎসা নিয়েও অনেক কথা বলেছেন। প্রশ্ন অনেকে এই পরিবারের, যা অজানা অনেক কাহিনি উন্মোচন করছে। অর্থাৎ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পর খোদ হাদির পরিবারের অন্দরের মনোভাবই একটা ভিন্ন চিত্র এঁকে দিচ্ছে। হাদির খুনে অভিযুক্ত ফয়জাল করিম মাসুদ ওরফে রাহুল (বয়স ৩৭) ও আলমগীর হোসেন (বয়স ৩৪) ধরা পড়েছে ভারতে। পরবর্তী পদক্ষেপ বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের। এ নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয়। কিন্তু একটা কথা বলতেই হচ্ছে, নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর প্রাক্তনীর এই চিত্রনাট্যটাও জমলো না। □

এক সুবর্ণ পথযাত্রী নবজাগরিত ভারত

সৌমিত্র সেন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব ও দিশা নির্দেশনায় 'বিকশিত ভারত'-এর সংকল্প একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ। এই সংকল্পে যুবসমাজের জন্য নতুন সুযোগ, কৃষকদের জন্য সুরক্ষা, মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য উৎসাহ, মধ্যবিত্তদের জন্য স্বস্তি এবং শ্রমজীবীদের জন্য সম্মান ও সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে এটি উদ্ভাবন, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটিয়ে কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন, পরিকাঠামো, পর্যটন, সংস্কৃতি এবং আমাদের জ্ঞান-ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করবে।

প্রকৃত অর্থেই বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে 'উন্নয়ন ও ঐতিহ্য'-এই মন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিকাঠামো, পর্যটন শক্তি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রান্তিক মানুষের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের মূলধারার সঙ্গে আরও দৃঢ়ভাবে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় এমএসএমই, স্টার্টআপ এবং দেশীয় উৎপাদনকে শক্তিশালী করে 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর ভিত্তিতে আরও সুদৃঢ় করার কথাও বলা হয়েছে।

'বিকশিত ভারত' সামগ্রিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে ভারতকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে যা সুদূর প্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদি। এই ভাবনা ও কর্মসূচির মাধ্যমে বিবিধ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান, দিক নির্দেশনা এবং প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। ফলস্বরূপ ২০৪৭ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষে ভারত একটি পূর্ণাঙ্গ উন্নত দেশ হিসেবে সমগ্র বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

'বিকশিত ভারত' ভাবনাটি শুধুই আর্থ-সামাজিক অথবা সাধারণ মানুষের আর্থিক স্থিতি সুনিশ্চিত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি সার্বিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বা সমন্বিত উন্নয়নের দর্শন, যেখানে সমাজ ও জনগণের অংশগ্রহণ, অর্থনীতি, পরিবেশ, সুশিক্ষা ও সুশাসনের সমন্বয়ই মূল লক্ষ্য।

বিকশিত ভারত বলতে এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে দারিদ্র্য সীমারেখাকে ছাপিয়ে যাবে না, জীবন যাত্রার মান উন্নততর হবে, শিক্ষা, খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা সকলের জন্য সহজলভ্য হবে। নাগরিক অধিকারের অংশ হিসেবে প্রশাসন হবে সুদক্ষ, স্বচ্ছ এবং দুর্নীতি মুক্ত। সাধারণত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে সমাজের সম্পদ অধিকতর হারে মুসলমান বিত্তবান শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত হয় এবং তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের সম্পদের আনুপাতিক পরিমাণ হ্রাস পায়। এই প্রবণতার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সকলের জন্য সমন্বিত প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার প্রয়োজন। দারিদ্র্যকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করা এবং এই দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণ। কেবল আয় বৃদ্ধির মধ্যেই নয় এবং ভাতা ভিত্তিক জীবনযাপন নয় বরং মানুষের চাহিদা, পছন্দ ও চাহিদা পূরণের সক্ষমতা ও স্বাধীনতার বিস্তারের মাধ্যমে সমন্বিত উন্নয়নের পথ খুঁজে পাওয়াই বিকশিত ভারতের প্রথম সোপান।

বিকশিত ভারত এমন স্বপ্নের একটি দেশ, যেখানে প্রতিটি নাগরিক তার সম্ভাবনা বাস্তবায়নের সুযোগ পাবে এবং সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল ধারায় যুক্ত না করলে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও নিম্ন আয়ের কারণে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন কিছুটা অসহনীয় হয়ে উঠছে।

তবুও ভারতের সামনে সম্ভাবনা রয়েছে। সঠিক দিক নির্দেশের মাধ্যমে বিপুল তরুণ জনসংখ্যা এবং তাদের মেধাকে কাজে লাগানো গেলে দ্রুত ডিজিটালাইজেশন, স্টার্টআপ সংস্কৃতি ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির বিকাশ দেশকে নতুন দিশা দেখাতে পারে। প্রয়োজন সুশাসন, দুর্নীতিমুক্ত মানসিকতা, দক্ষ নেতৃত্ব এবং সুসমন্বিত নীতি প্রণয়ন।

বিকশিত ভারত কেবল একটি সরকারি স্লোগান নয়— এটি একটি জাতীয় স্বপ্ন, মানুষের এক আবেগ। মানব সম্পদ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সকলের সামাজিক ন্যায়, সুশাসন ও পরিবেশগত ভারসাম্য নিশ্চিত করাই এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের মূল চাবিকাঠি। সমাজের সকল কাজে লিঙ্গ বৈষম্য, জাতি বৈষম্য ও বিভাজন দূরে সরিয়ে সঠিক পরিকল্পনা, নীতি কার্যকর করে ও সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে ২০৪৭ সালের মধ্যে নবজাগরণের মধ্য দিয়ে একটি সত্যিকারের বিকশিত ভারত গড়ে তোলা সম্ভব। □

রূপকথার সন্ধানে

দেবদাস কুণ্ডু

বিট্টুর খুব মন খারাপ। একটু আগে মরা সাদা পায়রাটার একটা ডানা ধরে ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে দাসদের পানাপুকুরে ফেলে দিয়ে এসেছে। হাট থেকে কিনে জলভরা মেঘের মতো হয়ে উঠেছিল। বৃষ্টি নামল বলে।

বিট্টুর একটা বড়ো অ্যাকোয়ারিয়াম ছিল। তাতে কত রকমের মাছ ছিল। রেড মলি, ব্ল্যাক মলি, গোল্ড ফিশ, সেই কষ্ট অনুভব করছে বিট্টু। চুপচাপ বসে আছে। ঠাকুমা বললেন,

—কী হয়েছে কর্তা?

—আচ্ছা ঠাকুমা, আমি যাকে পুষি, যাকে ভলোবাসি সেই-ই মরে যায়, কেন বলোতো?

এনেছিল ছানাটি। নিজে হাতে খাইয়ে বড়ো করেছিল। কী সুন্দর ডিগবাজি খেত আকাশে। কী যে অসুখ হলো, আজ মারা গেল। মেঘলা আকাশের মতো শোক নেমে এল বিট্টুর মনে।

বিট্টু এর আগে হাট থেকে একটি ময়না কিনে এনেছিল। কী সুন্দর কথা বলত। মাঝে মাঝে শিস দিত। বিট্টুর মন উদাস হয়ে যেত। তার নাম ধরে ডাকত। হঠাৎ একদিন সকালে দেখল খাঁচার ভেতর মরে পড়ে আছে পাখিটা। সেদিকে তাকিয়ে তার চোখদুটো টাইগার ফিশ। ঘরের আলো বন্ধ করে অ্যাকোয়ারিয়ামের দিকে তাকিয়ে থাকত। জলের ভেতরে আমাজন গাছ। লাল, নীল, হলুদ পাথর। একটা ছোটো পাহাড়। তার ভেতরে মাছগুলির অদ্ভুত বিচরণ তাকে মুগ্ধ করত। মনে মনে সে সমুদ্রে চলে যেত। শীতকালে মাছের গায়ে সাদা সাদা দাগ। এই রোগকে ফাঙ্গাস বলে। জলে তার ওযুধ ঢেলে দিত বিট্টু। হিটার দিত জল গরম রাখার জন্য। তবু একটা-একটা করে মাছ মরে যেত। সে যে কী কষ্ট! আজ আবার

—সব প্রাণীর মৃত্যু আছে কর্তা।

—তাহলে তুমিও কি একদিন মরে যাবে? তাহলে কে আমাকে ঠাকুমার ঝুলি, ক্ষীরের পুতুল, রূপকথার গল্প শোনাবে?

--রূপকথারা বুকের মধ্যে থাকে। তুমি মৃত্যুর কথা ভুলে রূপকথার দেশের কথা ভাববে। তাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখবে। তুমি নিজেই একদিন রূপকথার সন্ধান পেয়ে যাবে।

বিট্টুর চোখদুটো আনন্দে শীতের রোদ্দুরের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

জাতীয় উদ্যান

কানহা

কানহা জাতীয় উদ্যান মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের বালাঘাট ও মাণ্ডলা জেলা জুড়ে বৃহত্তম উদ্যান। এটি সুবিশাল তৃণভূমি, ঘন শাল ও বাঁশবন এবং শান্ত জলাশয়ের জন্য বিখ্যাত। বর্তমান উদ্যানটি ২৫০ ও ৩০০ বর্গ কিলোমিটারের হলন ও বানজার নামে দুটি সংরক্ষিত অঞ্চলে বিভক্ত। এই উদ্যানে এক হাজারেরও বেশি প্রজাতির ফুলগাছ রয়েছে। নিম্নভূমিতে শাল ও অন্যান্য বৃক্ষের বন রয়েছে। বন্যপ্রাণীর মধ্যে এই উদ্যানে রয়েছে বেঙ্গল টাইগার, ভারতীয় চিতাবাঘ, ঢোল, স্লথ, ভল্লুক, প্রচুর শেয়াল ও হরিণ। ৩০০ প্রজাতির পাখি রয়েছে। সবচেয়ে বেশি দেখা যায় কালো আইবিস, ঈগল, চিল, শকুন, নানা জাতের বক, সারস, হর্নবিল, কাঠঠোকরা, বন পায়রা, ময়না, ময়ূর প্রভৃতি।

এসো সংস্কৃত শিখি-১১৭

ভুতকাল– স্ত্রীলিঙ্গে (ভাগ : ১)
(অতীতকাল– স্ত্রীলিঙ্গে)
গতবতী – গিয়েছিল।

গতবান্ (পুং) – গতবতী (স্ত্রী)
আগতবান্ – আগতবতী।
হসিতবান্ – হসিতবতী।
খাদিতবান্ – খাদিতবতী।
ক্রীডিতবান্ – ক্রীডিতবতী।
বালিকা গতবতী – বালিকাটি গিয়েছিল্।
শ্রেয়া গতবতী – শ্রেয়া গিয়েছিল।

এরকম স্ত্রীলিঙ্গে **সা, এষা, কা, ভবতী, অহম** দিয়ে অন্য ক্রিয়াপদ সহযোগে এক-একটি বাক্য রচনা করতে হবে। যেমন **গতবতী** দিয়ে বাক্য রচনা করা আছে, সেরকম ভাবে।

ভালো কথা

আমের আঁটি

আমাদের গৌড় এলাকা আমবাগানে ভর্তি। এছাড়াও প্রায় সবার বাড়িতে দু'চারটে আমগাছ রয়েছে। কিন্তু আমাদের পাড়ার সুমনদের একটাও আমগাছ নেই। কিন্তু ওদের বাড়ির সবাই সারাদিন মাঠেঘাটে আমের আঁটি কুড়িয়ে বেড়ায়। ওগুলো রোদে শুকিয়ে রেখে দেয়। এখন এদের বাড়িতে পাঁচ বস্তা শুকনো আঁটি জমা হয়েছে। যারা আমের কলম করে তারা ওগুলো কিনে নিয়ে যায়। আষাঢ় মাসেই ওগুলো কিনতে লোক আসবে। মালদা যেতে কমলাবাড়ির কাছে একটি নার্সারিতে এরকম হাজার হাজার আমের আঁটি থেকে ছোটো ছোটো গাছ হয়েছে। এই গাছগুলোই বড়ো আমগাছের ডালে বেঁধে কলম তৈরি হবে।

শঙ্কর ঘোষ, নবমশ্রেণী, মহদীপুর, গৌড়, মালদা

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ন ল প্র পা
(২) ক্রি জা প্র ত

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ন ন ম মো দ হ
(২) য় য ম্প বি স ত্তি

৮ জুন সংখ্যার উত্তর
(১) ঠাকুরদাদা (২) দেশবন্দনা

৮ জুন সংখ্যার উত্তর
(১) অপব্যবহার (২) ঋণজর্জরিত

(১) কৃত্তিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, মালদা। (২) হৃতিকা মণ্ডল, জয়শ্রী, বাঁশদ্রোণী, কল-৭০ ।
(৩) পূজা মহান্তি, বরাবাজার, পুরুলিয়া (৪) শ্রেয়া সরদার, ক্যানিং, দ: ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন ও দেশভাগের ট্র্যাজেডি

শ্রীমার দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের আত্মপরিচয়

সৈকত নিয়োগী

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী দিন। দীর্ঘ দুই শতকের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটল, স্বাধীনতার সূর্য উদিত হলো। কিন্তু সেই সূর্যের আলো ছিল রক্তে রঞ্জিত। স্বাধীনতার সঙ্গে এসেছিল দেশভাগ, হিন্দু নরসংহারের কারণে এসেছিল উদ্বাস্তু স্রোত এবং দেশবাসীর হৃদয়ে গভীর ক্ষত। ভারতের স্বাধীনতা যেমন ছিল এক বিজয়ের কাহিনি, দেশভাগ তেমনই ছিল এক সভ্যতার আত্মবিভাজনের ইতিহাস।

এই ঘটনাকে অনেকেই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। কেউ একে ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি বলেছেন; কেউ-বা বলেছেন ঔপনিবেশিক কূটনীতির সফল ষড়যন্ত্র। কিন্তু এমন কিছু মানুষও ছিলেন, যাঁরা দেশভাগকে কেবল রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে দেখেননি। তাঁদের কাছে 'ভারত বিভাজন' ছিল মানবসভ্যতা, সংস্কৃতি ও চেতনার এক গভীর সংকট। সেই বিরল ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন 'শ্রীমা' (দ্য মাদার)— মিরা আলফাসা, যিনি শ্রীঅরবিন্দের সহযোগী, উত্তরসূরী এবং শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক।

শ্রীমার ভারতচিন্তা আজও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। কারণ তিনি ভারতবর্ষকে কেবল একটি দেশ হিসেবে দেখেননি। তাঁর কাছে ভারতবর্ষ ছিল একটি জীবন্ত শক্তি, একটি আত্মা, একটি আধ্যাত্মিক সত্তা। তাই দেশভাগের প্রশ্নে তাঁর অবস্থানও ছিল রাজনৈতিক সীমারেখার ঊর্ধ্বে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতের প্রকৃত ঐক্যকে ভৌগোলিক বিভাজনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে ভেঙে দেওয়া সম্ভব নয়।

ভারত সম্পর্কে শ্রীমার ধারণার উৎস খুঁজতে হলে আমাদের শ্রীঅরবিন্দের চিন্তার জগতে প্রবেশ করতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ মনে করতেন, প্রতিটি জাতির একটি স্বতন্ত্র আত্মা বা 'ন্যাশনাল সোল' রয়েছে। ভারতবর্ষের আত্মা অন্য সব জাতির তুলনায় বিশেষ, কারণ তার ঐতিহাসিক ভূমিকা মূলত আধ্যাত্মিক। রাজনৈতিক শক্তি, সামরিক আধিপত্য কিংবা অর্থনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে নয়, বরং মানবচেতনার বিকাশের মাধ্যমে ভারত বিশ্বকে পথ দেখাবে— এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

শ্রীমা এই ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে, ভারতবর্ষের প্রকৃত শক্তি নিহিত রয়েছে তার বহুত্বের মধ্যে। এই দেশে অসংখ্য ভাষা, জাতি, উপাসনা পদ্ধতি, আচার ও জীবনদর্শন সহাবস্থান করেছে। কখনও সংঘাত হয়েছে, কখনও সমন্বয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রহণক্ষমতা। এই কারণেই তিনি মনে করতেন, ভারতকে উপাসনা পদ্ধতি বা জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে ভাগ করা তার প্রকৃত ঐতিহাসিক চরিত্রের পরিপন্থী।

শ্রীমার চিন্তা আজও প্রাসঙ্গিক। কারণ তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন যে একটি দেশের জন্ম ও মৃত্যু হতে পারে, সীমান্ত পরিবর্তিত হতে পারে, রাজনৈতিক মতাদর্শ আসতে ও যেতে পারে, কিন্তু একটি সভ্যতার আত্মা অনেক দীর্ঘজীবী। সেই আত্মার নাম ভারতবর্ষ।

১৯৪৭ সালের দেশভাগ যখন বাস্তবে পরিণত হলো, তখন লক্ষ লক্ষ মানুষ রাতারাতি উদ্বাস্তু হয়ে গেলেন। পঞ্জাব ও বঙ্গের দুই প্রান্তে জেহাদিদের দ্বারা ভয়াবহ আক্রমণ শুরু হলো। প্রতিবেশী প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলল। ট্রেনে ট্রেনে হিন্দু ও শিখদের মৃতদেহ পৌঁছতে লাগল ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তের দুই দিকে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে বৃহত্তম অভিবাসন বা মাস-এক্সোডাসের অন্যতম এই ঘটনায় পশ্চিম ভারত, উত্তর-পশ্চিম ভারত ও পূর্ববঙ্গ থেকে কয়েক কোটি ছিন্নমূল মানুষ নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে খণ্ডিত ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শ্রীমা এই ঘটনাকে কেবল রাজনৈতিক ব্যর্থতা হিসেবে দেখেননি। তাঁর কাছে এটি ছিল মানুষের চেতনার অবনমনের প্রকাশ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ভয়, ঘৃণা ও বিভেদের রাজনীতি মানুষের অন্তর্নিহিত ঐক্যবোধকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এটাও বিশ্বাস করতেন যে, এই অন্ধকার স্থায়ী নয়।

স্বাধীনতার দিনেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিখ্যাত 'পাঁচটি স্বপ্ন'-এর ভাষণে দেশভাগ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, ভারতের বিভাজন স্থায়ী হবে না। একদিন ভারত আবার তার ঐক্য পুনরুদ্ধার করবে। এই বক্তব্যের মধ্যে রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণীর চেয়ে বেশি ছিল আধ্যাত্মিক বিশ্বাস। শ্রীমা পরবর্তী সময়ে বারবার এই মতকে সমর্থন করেন।

তাঁর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট— 'ভারতের বিভাজন' ইতিহাসের শেষ কথা নয়। কারণ ভারতবর্ষের ঐক্য কোনও আধুনিক রাজনৈতিক

নির্মাণ নয়। এটি হাজার হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ও সভ্যতাগত অভিজ্ঞতার ফল। সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা থেকে শুরু করে মৌর্য সাম্রাজ্য, গুপ্তযুগ, ভক্তি আন্দোলন, সন্ন্যাসী-বাউল-ফকির সংস্কৃতি, বঙ্গীয় নবজাগরণ— সমস্ত ইতিহাস মিলিয়ে ভারতবর্ষ এক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিসর গড়ে তুলেছে। রাজনৈতিক শাসক বদলেছে, সীমান্ত বদলেছে, কিন্তু এই সাংস্কৃতিক ঐক্য টিকে থেকেছে।

শ্রীমার কাছে 'অখণ্ড ভারত' ছিল না কোনও সামরিক বা ভূ-রাজনৈতিক ধারণা। বর্তমান সময়ে 'অখণ্ড ভারত' শব্দটি অনেক ক্ষেত্রেই বামমার্গীদের দ্বারা হয়ে ওঠে রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয়। রাষ্ট্রবাদীদের কাছে এই শব্দবন্ধ জাতীয়তার প্রতীক। বিচ্ছিন্নতাবাদী, দেশদ্রোহী বামপন্থীরা এতে সম্প্রসারণবাদের আশঙ্কা দেখে। শ্রীমার ভাবনায় 'অখণ্ড ভারত' ছিল সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক চেতনায় জারিত একটি বিষয়।

তিনি কখনও বলেননি যে, ভারতকে যুদ্ধ করে পাকিস্তান বা বাংলাদেশকে দখল করতে হবে। তিনি কখনও রাজনৈতিক জোরজবরদস্তির মাধ্যমে পুনরেকত্রীকরণের কথাও বলেননি। তাঁর কাছে 'অখণ্ড ভারত' মানে ছিল চেতনার ঐক্য। এমন এক অবস্থা যেখানে মানুষ নিজেদের উপাসনা পদ্ধতি বা রাজনৈতিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে বৃহত্তর মানবিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনকে স্বীকার করবে।

আধ্যাত্মিকতা ছাড়াও এই চিন্তার মধ্যে 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন'-এর মতো 'আধুনিক আঞ্চলিক সহযোগিতা'র ধারণার সঙ্গেও কিছু মিল হয়তো খুঁজে পাওয়া যায়। ইউরোপের বহু দেশ শতাব্দীর পর শতাব্দী যুদ্ধ করার পর শেষ পর্যন্ত পারস্পরিক সহযোগিতার পথ বেছে নিয়েছে। শ্রীমা বিশ্বাস করতেন, দক্ষিণ এশিয়ার জনগণও একদিন একই পথে এগোতে পারে।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় শ্রীমার মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বারবার বলেছেন, যুদ্ধ কোনও সমস্যার স্থায়ী সমাধান নয়। যুদ্ধ কেবল নতুন ক্ষত সৃষ্টি করে। তাঁর মতে, ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই নিজেদের শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যয় করছে, অথচ সেই শক্তি যদি মানুষের উন্নয়ন, শিক্ষা এবং কল্যাণে ব্যবহৃত হত, তাহলে সমগ্র অঞ্চল অনেক বেশি অগ্রসর হতে পারত।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় শ্রীমা পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালি জনগণের চরম দুর্ভোগের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ভয়াবহ অত্যাচারের খবর তাঁকে বিচলিত করেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে তিনি ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে দেখেছিলেন। তবে তাঁর বৃহত্তর বিশ্বাস ছিল যে, রাজনৈতিক বিভাজন সত্ত্বেও উপমহাদেশের মানুষের ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংযোগ কখনও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হবে না।

শ্রীমার 'অখণ্ড ভারত' ভাবনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি মনে করতেন, মানবসভ্যতা ধীরে ধীরে বৃহত্তর ঐক্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। 'নেশন-স্টেট'-এর ধারণা গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা মানবতার চূড়ান্ত গন্তব্য নয়। মানুষের চেতনা যত বিকশিত হবে, ততই সে সংকীর্ণ পরিচয়ের সীমা অতিক্রম করবে।

এই কারণেই তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ ভূমিকা সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন। তাঁর মতে, ভারত এমন এক সভ্যতা, যা বহুত্বের মধ্যে ঐক্যের শিক্ষা দেয়। বিশ্বের নানা প্রান্তে যখন ধর্মীয় সংঘাত, জাতিগত বিদ্বেষ এবং রাজনৈতিক মেরুকরণ বাড়ছে, তখন ভারতের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা মানবজাতির জন্য মূল্যবান হতে পারে।

আজ, দেশভাগের প্রায় আট দশক পরে দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত বাস্তবতা দেখা যায়। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ তিনটি পৃথক দেশ। তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থ, কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং জাতীয় পরিচয় রয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে দেখা যায়, ইতিহাস, সাহিত্য, ভাষা, সঙ্গীত, খাদ্যসংস্কৃতি এবং লোকস্মৃতির স্তরে তারা এখনও একে অপরের সঙ্গে যুক্ত।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যেমন ভারত নিজের বলে মনে করে, তেমনই বাংলাদেশও। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম দুই বঙ্গেরই কবি। যদিও ২০২৪ সালে বাংলাদেশে জেহাদি অভ্যুত্থানের সময় গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় কবিগুরুর মূর্তি, ধ্বংস করা হয় 'ছায়ানট'। লালনের গান, বাউল-ফকির দর্শন, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী, পঞ্জাবের লোকসঙ্গীত কিংবা সিন্ধু-সরস্বতীর আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য— সবই আজও একটি বৃহত্তর সভ্যতার স্মারক।

এই বাস্তবতাই শ্রীমার ভাবনাকে নতুন অর্থ দেয়। তিনি হয়তো কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক রূপরেখা দেননি, কিন্তু তিনি একটি দিকনির্দেশ দিয়েছিলেন— বিভেদের নয়, সংযোগের। প্রতিদ্বন্দ্বিতার নয়, সহযোগিতার। ঘৃণার নয়, মানবিকতার।

দেশভাগের স্মৃতি আজও উপমহাদেশের মানুষকে তাড়া করে বেড়ায়। লক্ষ লক্ষ পরিবারের ইতিহাসে উদ্বাস্তু হওয়ার কাহিনি রয়েছে। ছিন্নমূল মানুষের চোখের জল এখনও শুকোয়নি। কিন্তু শ্রীমার দৃষ্টিতে ইতিহাস কেবল অতীতের বোঝা নয়— ইতিহাস ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও।

তাঁর অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন কোনও মানচিত্রের পুনরঙ্কন নয়। এটি মানুষের মনের মধ্যে নির্মিত দেয়াল ভেঙে দেওয়ার স্বপ্ন। এমন এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন, যেখানে রাজনৈতিক সীমানা থাকবে, কিন্তু সীমানা মানুষের হৃদয়কে বিভক্ত করতে পারবে না।

সম্ভবত এই কারণেই শ্রীমার চিন্তা আজও প্রাসঙ্গিক। কারণ তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন যে একটি দেশের জন্ম ও মৃত্যু হতে পারে, সীমান্ত পরিবর্তিত হতে পারে, রাজনৈতিক মতাদর্শ আসতে ও যেতে পারে, কিন্তু একটি সভ্যতার আত্মা অনেক দীর্ঘজীবী। সেই আত্মার নাম ভারতবর্ষ।

আর সেই ভারতবর্ষ, শ্রীমার ভাষায়, শেষপর্যন্ত বিভেদের নয়, ঐক্যের পথেই অগ্রসর হবে। দেশভাগের রক্তাক্ত স্মৃতির মধ্যেও তিনি তাই দেখেছিলেন পুনর্মিলনের সম্ভাবনা, সংঘাতের মধ্যেও দেখেছিলেন মানবিকতার আলো। ইতিহাসের অন্ধকারতম মুহূর্তেও এই আশাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড়ো শক্তি। অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন তাই তাঁর কাছে কোনও রাজনৈতিক স্লোগান নয়, বরং মানবসভ্যতার ভবিষ্যতের প্রতি এক গভীর আস্থা।

শোকসংবাদ

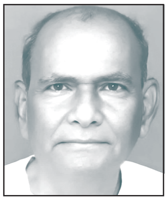

মালদহ নগরের এক সময়ের তিলক শাখার মুখ্যশিক্ষক এবং পরে কার্যবাহ, বর্তমানে বদ্রীনারায়ণ সরস্বতী শিশু মন্দিরের আচার্য সুশান্ত চৌধুরীর বাবা দ্বিজেন্দ্রনাথ চৌধুরী গত ৮ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি ২ পুত্র, নাতি-নাতনি ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

ব্যালট বিপ্লবে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন

তৃণমূলের পতনে পশ্চিমবঙ্গে 'অন্ধকার যুগে'র অবসান

ড. বিবেকানন্দ চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আকাশে এক দীর্ঘমেয়াদি ও দমবন্ধ করা অধ্যায়ের অবসান ঘটেছে। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্ট হতেই দেখা গেল, রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষমতাচ্যুত হওয়া কেবল একটি রাজনৈতিক দলের পরাজয় নয়; সাধারণ মানুষের চোখে এটি এক যুগের অবসান— যা গত এক দশক ধরে দুর্নীতি, হিংসা এবং একদলীয় আধিপত্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ তাঁদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, যা রাজ্য রাজনীতিতে এক নজিরবিহীন ঐতিহাসিক মুহূর্ত তৈরি করেছে।

বিগত বছরগুলোতে পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তার মূল ভিত্তিই ছিল ভয় এবং সাধারণ মানুষের ওপর জোরজুলুম। পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে শুরু করে সাধারণ নির্বাচন, প্রতিবারই বিরোধীদের মনোনয়ন জমা দিতে না দেওয়া, বুথ দখল এবং নির্বাচনের দিনগুলোতে রক্তক্ষয়ী হিংসা নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শাসক দলের বিরুদ্ধে কোনো কথা বললেই জুটত মামলা বা শারীরিক হেনস্থার হুমকি।

এবারের নির্বাচনে সাধারণ মানুষ 'থ্রেট কালচার' বা হুমকির রাজনীতিকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভয়কে জয় করে মানুষ যেভাবে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন, তা প্রমাণ করে যে মানুষ ভেতরে ভেতরে কতটা পরিবর্তন চাইছিলেন। এই পরাজয় আসলে স্বৈরাচারী মানসিকতার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের এক নীরব কিন্তু শক্তিশালী জয়।

তৃণমূল জমানার সবচেয়ে বড়ো কলঙ্ক ছিল শিক্ষাক্ষেত্র থেকে শুরু করে সরকারি পরিষেবার প্রতিটি স্তরে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি। যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের চোখের জল এবং রাজপথে তাঁদের বছরের পর বছর ধরে চলা আন্দোলন রাজ্যবাসীকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল। অন্যদিকে, শাসক দলের শীর্ষনেতাদের বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হওয়ার দৃশ্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভোলেনি। শুধু শিক্ষা নয়; কয়লা বালি ও রেশন বণ্টনের মতো অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলোতেও দুর্নীতির যে জাল বিস্তার লাভ করেছিল, তা রাজ্যের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে ভেঙে দিয়েছিল। এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির চক্রে বড়ো আঘাত লেগেছে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

২০২৬ সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘ ১৫ বছরের রাজনৈতিক স্থবিরতা ও একক দলের আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে একটি নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) রাজ্যে প্রথমবার সরকার গঠন করার মাধ্যমে দীর্ঘ প্রায় অর্ধশতাব্দীর 'সংঘাতময় রাজনীতি'র অবসান ঘটেছে। ৯ মে ২০২৬ তারিখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীর পুণ্যলগ্নে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী শপথ গ্রহণ করেছেন। এই ক্ষমতার পরিবর্তন কেবল দলীয় পরিবর্তনের প্রতীক নয়, বরং সুশাসন, অর্থনৈতিক সংস্কার, জনতান্ত্রিক স্থায়িত্ব এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্যের ১০ কোটিরও বেশি মানুষের গভীর প্রত্যাশার এক ঐতিহাসিক প্রতিফলন।

বিগত সরকারের জনবিরোধী নীতি এবং কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের আবহে দীর্ঘকাল ধরে বঞ্চনার শিকার হওয়া নাগরিক সমাজ এখন এক সুদূরপ্রসারী সংস্কারের প্রত্যাশা করছে। *(সারণী-১ দ্রষ্টব্য)*

বিগত সরকারের আমলে তৃণমূল কংগ্রেসের তথাকথিত 'ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজনীতি' এবং সমান্তরাল সিন্ডিকেট অর্থনীতি রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতাকে চরমভাবে ব্যাহত করেছিল। এই শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় দলীয় প্রধানরা 'ব্র্যান্ড-মমতা' ব্যবহার

সারণী-১

২০২৬ সালের নির্বাচনোত্তর দলীয় আসন ও ভোটের হারের তুলনামূলক চিত্র

রাজনৈতিক দল	আসন সংখ্যা (২০২৬)	আসন সংখ্যা পরিবর্তন (২০২১ বনাম ২০২৬)	প্রাপ্ত ভোট শতাংশ (২০২৬)	ভোট শতাংশের পরিবর্তন (%)
ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)	২০৮	+১৩০	৪৫.৮৪	+৭.৬৯
সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস	৮০	–১৩৫	৪০.৮০	–৭.২২
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	২	+২	২.৯৭	—
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)	১	+১	৪.৪৫	—
অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্ট	১	০	১.৫৩	—
আম জনতা উন্নয়ন পার্টি	২	+২	০.৭৪	—

করে নিজেদের এলাকায় একচেটিয়া আধিপত্য ও চাঁদাবাজির রাজত্ব কায়েম করত এবং এর বিনিময়ে রাজ্য নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করত। সাধারণ মানুষের প্রধানতম প্রত্যাশা হলো এই কুখ্যাত 'কাটমানি' ও সিন্ডিকেট সংস্কৃতির স্থায়ী অবসান ঘটিয়ে একটি নিয়মতান্ত্রিক আইনি পরিবেশ ফিরিয়ে আনা।

নতুন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রত্যাশাকে সামনে রেখে স্পষ্ট ঘোষণা করেছে যে, রাজনৈতিক দল এবং রাজ্য প্রশাসন দুটি সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা হিসেবে পরিচালিত হবে। দলীয় কার্যালয় থেকে প্রশাসনিক নির্দেশ জারি না করে মহাকরণ 'নবান্ন' থেকেই আইনানুগভাবে শাসন কাজ পরিচালিত হবে। শিল্পের প্রবেশদ্বারে তোলাবাজি বা চাঁদাবাজির মতো অরাজক পরিস্থিতি দমন করার জন্য নতুন কঠোর আইন প্রবর্তনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিগত ১৫ বছরের দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অস্বচ্ছতা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের সংকল্প নেওয়া হয়েছে, যা মূলত পূর্বতন সরকারের আর্থিক অব্যবস্থাপনা এবং কয়লা, বালি ও পাথর পাচার চক্রের অন্ধকার দিকগুলিকে উন্মোচন করবে।

২০২৬ সালের নির্বাচনে সবচেয়ে বিতর্কিত এবং সুদূরপ্রসারী ঘটনা ছিল ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক পরিচালিত 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন'। এই প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৯০ লক্ষের বেশি নাম (মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ) বাদ দেওয়া বা পুনর্মূল্যায়ন করা হয়। এই সংশোধনের ফলে সীমান্তবর্তী মুসলমান প্রধান জেলাগুলি, বিশেষত মুর্শিদাবাদ ও মালদহে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথাগত ভোটব্যাংকে ধস নামে। হিন্দু ভোটারদের ব্যাপক সংগঠিত এবং এই ভোটার তালিকা পরিশোধনের ফলে রাজনৈতিক দৃশ্যপটে এক বিশাল পরিবর্তন আসে, যা বিজেপির বিপুল আসন জয়ের পথ প্রশস্ত করেছে। *(সারণী-২ দ্রষ্টব্য)*

সারণী-২

বিশেষ নিবিড় সংশোধন এবং নির্বাচনোত্তর আসনভিত্তিক প্রভাব

নির্বাচনী কেন্দ্র	২০২১ বিজয়ী ও ব্যবধান	২০২৬ বিজয়ী ও ব্যবধান	এসআইআর সংশোধিত/বাতিলকৃত ভোটার সংখ্যা	রাজনৈতিক তাৎপর্য ও প্রভাব
কুশমণ্ডি	তৃণমূল কংগ্রেস	বিজেপি (৯,০৬৩)	১৩,৫০০	বাতিলকৃত ভোটার সংখ্যা জয়ের ব্যবধানকে ছাড়িয়ে যাওয়ায় নির্বাচনী ফলাফল বিজেপির অনুকূলে যায়।
করণদিঘি	তৃণমূল কংগ্রেস (৩৬,৬২৬)	বিজেপি (১৯,৮৬৯)	৩১,৫৬২	ভোটার বাতিলের প্রভাব সরাসরি তৃণমূলের হারের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত।
চুঁচুড়া	তৃণমূল কংগ্রেস (১৮,৪১৭)	বিজেপি (৪৩,৪৩৫)	১১,৮২৮	এসআইআর-এর বাইরেও বিজেপির ব্যাপক জনসমর্থন বৃদ্ধির নজির।
রাণীবাঁধ	তৃণমূল কংগ্রেস (৩,৯৩৯)	বিজেপি (৫২,২৬৯)	৫২২	জঙ্গলমহলে জনজাতি ভোটারদের বিজেপির প্রতি দৃঢ় আস্থার বহিঃপ্রকাশ।
সামসেরগঞ্জ	তৃণমূল কংগ্রেস (২৬,০০০+)	তৃণমূল কংগ্রেস (৮,০০০-	৭৫,০০০	মুসলমান প্রধান এলাকায় তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান নাটকীয়ভাবে হ্রাস পাওয়ার কারণ ব্যাপক ভোটার বাতিল।

জনগণের প্রত্যাশাকে মর্যাদা দিয়ে এবং জাতীয় সুরক্ষার স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রীসভা তাদের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য বিএসএফ-এর হাতে আটকে থাকা জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৪ জোনের ৪৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ অলক্ষিত সীমান্তের মধ্যে ২৮৬ কিলোমিটার জমি জট দ্রুত মেটানোর লক্ষ্যে ৪৫ দিনের সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে। একই সঙ্গে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে রাজ্যজুড়ে এনআরসি বা সেন্সাস প্রক্রিয়ার সূচনা এবং আটক কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রসাসনিক নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

বিগত সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে আটকে রাখার যে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, তার অবসান ঘটিয়ে রাজ্যের সাধারণ মানুষ দ্বিমুখী সুফলের প্রত্যাশা করছে। এই প্রত্যাশা পূরণে নতুন সরকার প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। পূর্বতন সরকারের জনপ্রিয় 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পকে প্রতিস্থাপন করে নতুন সরকার নিয়ে এসেছে 'অন্নপূর্ণা যোজনা', যার অধীনে ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি যোগ্য মহিলাদের মাসিক আর্থিক সহায়তার পরিমাণ দ্বিগুণ করে ৩ হাজার টাকা করা হয়েছে। ১ জুন ২০২৬ থেকে এই প্রকল্পের সুফল সরাসরি আধার-সংযুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হবে। এছাড়া পূর্বতন 'স্বাস্থ্য সাথী' প্রকল্পকে কেন্দ্রীয় ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প 'স্বাস্থ্য যোজনা' বা 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর সঙ্গে একীভূত করার কাজ শুরু হয়েছে, যা ১ জুলাই

২০২৬ থেকে কার্যকর হবে। *(সারণী-৩ দ্রষ্টব্য)*

এছাড়াও শিক্ষাঙ্গনে দেশেপ্রেমের চেতনা জাগ্রত করতে সমস্ত সরকারি ও সরকার-পোষিত বিদ্যালয়ে প্রাত্যহিক প্রার্থনায় বাধ্যতামূলকভাবে 'বন্দে মাতরম্' গাওয়ার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান জিএসডিপি প্রায় ২১.৪৮ লক্ষ কোটি টাকা হলেও এর সিংহভাগই অনুৎপাদক সেবা ক্ষেত্র (৫৫ শতাংশ) এবং কৃষি (২১ শতাংশ) ভিত্তিক, যা দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যর্থ। রাজ্যের ঘাড়ে চেপে থাকা বিশাল ঋণের বোঝা (৭.৭১ লক্ষ কোটি) এবং মাথাপিছু ঋণের বিপুল বৃদ্ধির ফলে বাজেট বরাদ্দ প্রায়শই সংকুচিত হয়। বিগত সরকারের সময়ে হওয়া 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট' মাত্র ৩ শতাংশ কার্যকারিতার জন্য তীব্র সমালোচিত হয়েছে।

নতুন সরকারের কাছে শিল্পপতি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রত্যাশা হলো একটি স্থায়ী ও সরলীকৃত জমি নীতি প্রণয়ন করা। ১০০ দিনের মধ্যে একটি নতুন ভূমি নীতি এবং ডেটা নীতি প্রকাশের মাধ্যমে রাজ্যে বৃহৎ বেসরকারি বিনিয়োগ আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের প্রাণভোমরা চা বাগিচাগুলির আধুনিকীকরণ, সিঙ্গুরে প্রস্তাবিত নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক গড়ে তোলা এবং কোলাঘাট-খড়্গপুর সংলগ্ন অঞ্চলের পরিকাঠামো রূপান্তর মানুষের অন্যতম প্রধান দাবি। এছাড়া, হুগলির ডানকুনি থেকে গুজরাটের সুরাট পর্যন্ত প্রস্তাবিত 'ইস্ট-ওয়েস্ট ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোর' রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনৈতিক মানচিত্রকে বদলে দিতে পারে। চিকিৎসা পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, দক্ষিণ দিনাজপুর ও আসানসোলে নতুন মেডিক্যাল কলেজ এবং উত্তরবঙ্গে একটি এইমস স্থাপনের দাবিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

নির্বাচন পরবর্তী হিংসা এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতি পশ্চিমবঙ্গের এক চিরস্থায়ী ব্যাধি। বিগত ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সংগঠিত হওয়া হিংসাত্মক ঘটনাগুলির তদন্ত পুনরায় শুরু করতে ১২,৫০০টি মুলতুবি এফআইআর-এর পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

এই রাজনৈতিক আবহে ডায়মন্ড হারবার লোকসভার অন্তর্গত অত্যন্ত হাই-প্রোফাইল ফলতা বিধানসভা আসনের পুনর্নির্বাচন ছিল নবগঠিত সরকারের রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতার প্রথম লিটমাস টেস্ট। ইভিএমে কারচুপি ও ভোটার ভীতি প্রদর্শনের কারণে বাতিল হওয়া প্রথম দফার ভোটের পর, ২১ মে ২০২৬ তারিখে ৩৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় ৮৭ শতাংশ রেকর্ড ভোটদান সম্পন্ন হয়। এই উপনির্বাচনে বিজেপির দেবাংশু পণ্ডা ১,৪৯,৬৬৬ ভোট পেয়ে তৃণমূলের দুর্গ হিসেবে পরিচিত ফলতায় ১,০৯,০২১ ভোটের ব্যবধানে এক বিশাল ঐতিহাসিক জয় নথিভুক্ত করেন। অন্যদিকে, তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থী জাহাঙ্গির খান ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে নাটকীয়ভাবে লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা করায় তৃণমূল চতুর্থ স্থানে নেমে এসে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। মুসলমান অধ্যুষিত এই এলাকায় মুসলমান ভোটের তৃণমূল থেকে বাম ও কংগ্রেস শিবিরে স্থানান্তর ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সমীকরণের এক নতুন দিক নির্দেশ করছে।

পশ্চিমবঙ্গের নব নির্বাচিত সরকারের বিপুল ম্যান্ডেটের পেছনে যেমন নিহিত রয়েছে দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক অনিয়মের ক্ষোভ, তেমনই রয়েছে এক অলীক বা অপ্রাপ্য স্বর্গ তথা 'সোনার হরিণ' পাওয়ার অদম্য আকুলতা। সুশাসন প্রতিষ্ঠা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং কাটমানিমুক্ত সুষ্ঠু বাণিজ্যিক পরিবেশ তৈরি করতে না পারলে এই ঐতিহাসিক বিজয় কেবল একটি নির্বাচনী সাফল্যের বুদবুদ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যেতে পারে।

রাজ্যের স্থায়ী অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য অনুৎপাদক সমাজকল্যাণমূলক সরাসরি ক্যাশ ট্রান্সফারের তুলনায় মানব সম্পদ উন্নয়ন ও মূলধনী পরিকাঠামো সৃষ্টিতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। একই সঙ্গে দ্রুত একটি সুদূরপ্রসারী ও গতিশীল জমি নীতি চালু করা প্রয়োজন যাতে ক্ষুদ্র জোতের জটিলতা কাটিয়ে শিল্পপতিরা সরাসরি রাজ্যে বিনিয়োগ করতে পারেন। দল ও প্রশাসনকে সম্পূর্ণ পৃথক রেখে প্রান্তিক ব্লক স্তর পর্যন্ত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও 'জনতা দরবার' ব্যবস্থার মাধ্যমে সরাসরি নাগরিক অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করাই নতুন সরকারের মূল সাফল্যের চাবিকাঠি হতে পারে।

(লেখক রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত জাতীয় শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক)

সারণী-৩

২০২৬ নির্বাচনের পর সরকারি নীতি ও জনকল্যাণমূলক রূপান্তরের রূপরেখা

বিষয় ক্ষেত্র	পূর্বতন প্রকল্প	বর্তমান প্রকল্প	বাস্তবায়নের সময়সীমা ও লক্ষ্য
নারী ক্ষমতায়ন	লক্ষ্মীর ভাণ্ডার (৫০০-১৫০০)	অন্নপূর্ণা যোজনা (মাসিক ৩,০০০ টাকা)	১ জুন ২০২৬ থেকে প্রথম দফার ফর্ম বিতরণ
স্বাস্থ্য নিরাপত্তা	স্বাস্থ্য সাথী (আংশিক কভারেজ)	আয়ুষ্মান ভারত (বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা ক্যাশলেস	১ জুলাই ২০২৬ থেকে দেশব্যাপী হাসপাতাল নেটওয়ার্ক চালু
সরকারি নিয়োগ	অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক ও অস্বচ্ছ নিয়োগ	স্বচ্ছ মেধা-ভিত্তিক স্থায়ী নিয়োক ও বয়সে ৫ বছরের ছাড়	ডিসেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে সকল শূন্যপদ পূরণ
কর্মচারী কল্যাণ	বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) জট	বকেয়া ডিএ নিষ্পত্তি ও ৭ম বেতন কমিশন কার্যকর	সরকার গঠনের ৪৫ দিনের মধ্যে বাস্তবায়ন
সামাজিক সুশাসন	যত্রতত্র মদের দোকানের লাইসেন্স	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মন্দিরের ১ কিমি মদ নিষিদ্ধ	অবিলম্বে কার্যকর এবং কঠোর আইনি নজরদারি
খাদ্য সুরক্ষা	স্বল্পমূল্যের চাল-গম বণ্টন	সপ্তাহে ২ দিন ৫ টাকায় মাছ-ভাত ভোজন	৪০০টি বিশেষায়িত ক্যান্টিনের মাধ্যমে বিতরণ

যখন চেনা শোষকই রাতারাতি 'তৎকাল বিজেপি' সাজে : পশ্চিমবঙ্গের তখন এক জলজ্যান্ত সংকট

বিপ্লব বিকাশ

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 'ভালো তৃণমূল'-এর ভোলবদল এবং ক্ষমতার অলিন্দে তাদের পুনর্বাসন এখন এক নতুন ও গভীর সংকটের জন্ম দিয়েছে। রাজ্যে সেই দাম্ভিক তৃণমূল আজ আর প্রধান বিরোধী দলের অবস্থানেও নেই। কিন্তু ক্ষমতার এই পরিবর্তনের পরও সাধারণ মানুষের, সচেতন নাগরিক ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদদের সবচেয়ে বড়ো 'চিন্তা' এখানেই যে, যে সমস্ত দুষ্কৃতী, সিন্ডিকেট-তোলাবাজ ও হুমকির নায়কদের বিরুদ্ধে মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছিল, তাদেরই একটি অংশ এখন বিজেপির বহু বিধায়ক ও নেতার চারপাশে 'ভালো তৃণমূল' সেজে ভিড় জমিয়েছে। ক্ষমতার নতুন সমীকরণে জায়গা করে নিতে এই দাগি ব্যক্তিরা যেভাবে ভিড় করছে তা এক অদ্ভুত সংকট তৈরি করছে।

এই সুবিধাবাদী ও ছদ্মবেশীদের অনুপ্রবেশের ফলে আজ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, অবহেলিত ও কোণঠাসা বোধ করছেন বিজেপির সেই সমস্ত পুরোনো ও নিষ্ঠাবান কর্মীরা, যারা অতীতে নিজেদের জীবন বাজি রেখে, সমস্ত রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ময়দানে লড়াই করেছিলেন। বিশেষ করে, বিগত বছরগুলিতে ভয়াবহ রাজনৈতিক হিংসার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যারা বুক চিতিয়ে সংগঠনের পতাকা ধরে রেখেছিলেন, আজ তারা দেখছেন— গতকাল যে শোষক বা মস্তান তাদের ওপর অত্যাচার করেছিল, আজ ক্ষমতার পরিবর্তনের পর তারা স্থানীয় নেতার পাশে 'ভালো মানুষ' সেজে ভিআইপি আসনে বসে আছে। এর ফলে স্বভাবতই আদি ও ত্যাগী কর্মীদের মনোবল ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গের বুকে যে সমস্ত সনাতনী ও হিন্দু সংগঠনের কার্যকর্তারা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে চলেছেন, তারাও আজ বিভিন্ন এলাকায় এই ভোলবদলু 'ভালো তৃণমূল'-এর চক্রান্তে অপমানিত হচ্ছেন, নতুন করে বিপদে পড়ছেন। তৃণমূলের সেই পুরোনো পেশিশক্তি ও মাফিয়া মানসিকতার ছায়া এখন শাসক শিবিরের একাংশকে গ্রাস করতে চলায় পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ একে মোটেও ভালো চোখে দেখছেন না।

শাসক দল হিসেবে সংগঠনের বিস্তার বা রাজনৈতিক পরিধি বৃদ্ধি করা নিশ্চিতভাবেই প্রয়োজন, তা নিয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। একটি স্থায়ী ও শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে গেলে আরও নতুন মানুষকে যুক্ত করতে হবে। কিন্তু সেই বিস্তারের শর্টকাট রাস্তা যদি হয় পুরোনো দাগি অপরাধীদের গায়ে 'ভালো'র তকমা লাগিয়ে নিয়ে নেওয়া, তবে তা আদতে দলের নৈতিক ভিত্তি ও বিশ্বাসযোগ্যতাকেই পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। চোরকে পাশে বসিয়ে চুরির বিরুদ্ধে লড়াই বা সুশাসনের দাবি জানালে তা প্রহসনে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এক বুক আশা নিয়ে বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছে; তাই এই অপরাধীদের আশ্রয় দিলে জনগণের সেই ভরসা চিরতরে হারিয়ে যাবে। এখন সময় এসেছে এই শর্টকাট রাজনীতি বন্ধ করে এক আমূল কাঠামোগত পরিবর্তনের পথে হাঁটার।

বর্তমান শাসক দলের এই আত্মঘাতী পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে এবং পশ্চিমবঙ্গের বুকে প্রকৃত সুশাসন ও জাতীয়তাবাদী বিকল্পকে ধরে রাখতে এখন সুনির্দিষ্ট ও কঠোর কিছু পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রথমত, ক্ষমতার লোভে বা কেবল লোকবল বাড়াতে পুরোনো দাগি অপরাধীদের ওপর নির্ভর করার মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে। এর পরিবর্তে সমাজের বিভিন্ন স্তরের সৎ, নিষ্ঠাবান, শিক্ষাবিদ ও পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির নতুন ব্যক্তিত্বদের খুঁজে বের করা প্রয়োজন। এই নতুন ও পরিচ্ছন্ন মুখের আগমন সুনিশ্চিত করতে তাদের সঙ্গে নিবিড় জনসংযোগ তৈরি করতে হবে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে তাদের প্রশাসনের সহযোগী ও সংগঠনের মূল স্রোতে নিয়ে আসতে হবে।

দ্বিতীয়ত, শুধু দলে অন্তর্ভুক্ত করাই যথেষ্ট নয়, নতুন ও রাজনীতিতে আসতে আগ্রহী কর্মীদের জন্য দলীয় স্তরে নিয়মিত কঠোর নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই নবাগতদের মধ্যে প্রকৃত রাজনৈতিক সচেতনতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সুশাসনের ভিত তৈরি করা সম্ভব, যা দীর্ঘমেয়াদে জাতীয় আদর্শকে পুষ্ট করবে।

তৃতীয়ত, সংগঠনের প্রত্যেকটি স্তরে দলের মূল আদর্শ ও বিচারধারার প্রতি ধারণা একদম পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। নবাগতদের মনে এই বোধ গভীরভাবে প্রোথিত করতে হবে যে, রাজনীতি কেবলই ক্ষমতা ভোগ করা বা যেকোনো উপায়ে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার মাধ্যম নয়, বরং এটি সমাজ ও সংস্কারের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার। বিচারধারার এই স্পষ্টতাই ছদ্মবেশী অনুপ্রবেশকারীদের সহজে চিহ্নিত করতে এবং তাদের দূর করতে ছাঁকনি হিসেবে কাজ করবে।

আজ রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অগ্নিপরীক্ষা। মানুষ ক্ষমতার কেবল পরিবর্তন চায়নি, ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চেয়েছে। তাই পুরোনো তোলাবাজদের গায়ে 'ভালো'র তকমা লাগিয়ে আড়াল করার আত্মঘাতী খেলা এখনই বন্ধ করতে হবে। এই ছদ্মবেশীদের হটিয়ে যখন কঠিন দিনের পরীক্ষিত আদি কর্মী, হিন্দু সংগঠনের নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা এবং সমাজের পরিচ্ছন্ন নতুন মুখগুলি চালিকাশক্তি হবে, তখনই সুশাসনের দেখা মিলবে। অপরাধীকে কেবলই অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে উপড়ে ফেলাই আজ পশ্চিমবঙ্গে সুশাসন প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ।

কলকাতায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস—২০২৬

গত ২১ জুন সমগ্র ভারত জুড়ে উদ্‌যাপিত হয় '১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস'। ভারত সরকারের আয়ুশ মন্ত্রকের উদ্যোগে 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' উদ্‌যাপনের কেন্দ্রীয় কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। সহযোগিতায় ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর। গত ১৩ জুন বিধাননগর-স্থিত স্বাস্থ্যভবনে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি নারায়ণস্বরূপ নিগম '১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' উদ্‌যাপনের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানান। তিনি বলেন যে, আগের বছর গোটা দেশের মধ্যে বিশাখাপত্তনমে কেন্দ্রীয়ভাবে উদ্‌যাপিত হয় 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস'। এবছর 'কলকাতা'কে হোস্ট সিটি হিসেবে ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই মহতী অনুষ্ঠানকে সফল করার লক্ষ্যে যৌথভাবে অনেকগুলি কর্মসূচি রূপায়ণে ব্রতী হয়েছে কেন্দ্রীয় আয়ুশ মন্ত্রক, মোরারজী দেশাই রাষ্ট্রীয় যোগ সংস্থান, পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিরেক্টরেট অফ আয়ুর্বেদ ও ক্রীড়া ভারতী। এই বছর সর্বাধিক মানুষের অংশগ্রহণের দ্বারা আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপনের ওপর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে 'গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ফর যোগ'-শীর্ষক রেকর্ড গড়ার লক্ষ্যে জাতীয় স্তরে সর্বাত্মক প্রয়াস চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় আয়ুশ মন্ত্রক। এবছর 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস'-এর থিম হলো— 'যোগ ফর হেলদি এজিং'। কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার জন্য একটি টোল-ফ্রি নম্বর— '১৮০০-৩১৫-৭০০৮' ঘোষিত হয়েছে। এই নম্বরে মিসড্ কল করলে সেই মোবাইল নম্বরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হোয়াটস্‌অ্যাপে হ্যাবিল্ডের পক্ষ থেকে 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস'-এর কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার 'পার্টিসিপেশন লিঙ্ক' চলে আসবে। সেই লিঙ্কের মাধ্যমে সকলে সেই কার্যক্রমগুলিতে ভার্চুয়ালি যুক্ত হতে পারবেন বলে জানান স্বাস্থ্যসচিব। 'কমন যোগ প্রোটোকল' অনুসরণে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপিত হবে বলেও তিনি জানান। 'কমন যোগ প্রোটোকল' হলো ৪৫ মিনিটের একটি বিজ্ঞানসম্মত যোগ-অনুশীলন ক্রম, যা ২১ জুন দেশজুড়ে অনুশীলন করা হয়। বিশ্ব রেকর্ড স্থাপনের লক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্টের মধ্যে অন্যতম ছিল গত ১৪ জুন সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে আয়োজিত একটি অনলাইন কার্যক্রম— 'মোস্ট ভিউয়ার্স ফর এ ইউটিউব যোগ লাইভ স্ট্রিম (নেশন-ওয়াইড অ্যান্ড গ্লোবাল পার্টিসিপেশন)'। কমন যোগ প্রোটোকল অনুসারে যোগানুশীলনের পর কেন্দ্রীয় আয়ুশমন্ত্রী শ্রী প্রতাপরাও যাদব সমগ্র ভারত-ব্যাপী যোগ দিবস উদ্‌যাপনের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে এই কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপনের কেন্দ্রীয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে হোস্ট সিটি 'কলকাতা' হওয়ার কারণে গত ৭ জুন থেকে ২০ জুন পর্যন্ত '১৪ দিনের কাউন্টডাউন অ্যাক্টিভিটি প্ল্যান' ঘোষণা করে এরাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। কার্যক্রমের স্থান ও সময়সূচি নিম্নরূপ : (১) ৭ জুন— সানডে অন সাইকেলস্ (সাইক্লিং ক্যাম্পেন অ্যান্ড যোগ ডেমন্সট্রেশন : সব জেলা ও মহকুমার সদরে)। (২) ৮ জুন— যোগ ফর গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ (যোগ ডেমন্সট্রেশন ইন অল ডিপার্টমেন্টস্ : সব সরকারি দপ্তর ও কার্যালয়ে)। (৩) ৯ জুন— যোগ ইন স্কুলস্ ডে (যোগ ডেমন্সট্রেশন ইন স্কুলস্ : মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর)। (৪) ১০ জুন— যোগ অ্যান্ড মেন্টাল ওয়েল-বিইং ডে (যোগ টু কমব্যাট অ্যাংজাইটি অ্যান্ড স্ট্রেস : উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলী)। (৫) ১১ জুন— যোগ অ্যান্ড উইমেন্স হেল্‌থ (স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা, অঙ্গনওয়ারি ও আশা কর্মী : সব জেলায়)। (৬) ১২ জুন— যোগ ফর ট্রাইবাল বেঙ্গল (ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর)। (৭) ১৩ জুন— যোগ ফর সিনিয়র সিটিজেন্স (যোগ ইন অকুপেশনাল হেল্‌থ ফর টি-গার্ডেন ওয়ার্কার্স : কালিম্পং, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার)। (৮) ১৪ জুন— যোগ বাই দ্য বিচ (যোগ ফর ইয়ুথ অ্যান্ড স্পোর্টস্ ; যোগ থ্রু ইউটিউব : পূর্ব মেদিনীপুর)। (৯) ১৫ জুন— যোগ সঙ্গম দিবস (হাওড়া ব্রিজ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, সুন্দরবন, কোচবিহার ও মুর্শিদাবাদ)। (১০) ১৬ জুন— যোগ ইন হেল্‌থ-কেয়ার ইনস্টিটিউশন্স ; যোগ ইন দ্য হিলস্ (আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির, আয়ুশ আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি-সহ এরাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে)। (১১) ১৭ জুন— যোগ ইন কারেকশনাল অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার হোমস্, ওল্ডেজ হোমস্ ; যোগ ফর কর্পোরেটস্, ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড ব্যাংকার্স (নদীয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান; যোগ অ্যাট রাঙামাটি— শান্তিনিকেতন)। (১২) ১৮ জুন— যোগ ফর পুলিশ, ফরেস্ট গার্ডস্ অ্যান্ড ফায়ার ব্রিগেড (সব জেলায়)। (১৩) ১৯ জুন— রান ফর যোগ (সব জেলায়)। (১৪) ২০ জুন— প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত, পুরসভায় যোগানুশীলন (সব জেলায়)। এছাড়াও ২০ জুন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' উদ্‌যাপনের সঙ্গেই গঙ্গাতীরে অনুষ্ঠিত হয় 'হুগলী কালচারাল যোগ কার্নিভাল'। সরকারি অফিস, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন, স্পোর্টস্ ক্লাব ও সাধারণ মানুষ যাতে 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস'-এর কার্যক্রমে ভার্চুয়ালি যুক্ত হতে পারেন, তার জন্য 'যোগ সঙ্গম'-নামক একটি রেজিস্ট্রেশন পোর্টালের বিষয়েও জানান স্বাস্থ্যসচিব। এই পোর্টালের লিঙ্ক হলো--- 'https://yoga.ayush.gov.in/yoga-sangam'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে ২১ জুন কলকাতায় রেড রোডে 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস'-এর মেইন ইভেন্টটি অনুষ্ঠিত হয়। □

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

রাষ্ট্রঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী ও রাষ্ট্রজাগরণের মহামন্ত্র 'বন্দে মাতরম্'-এর ১৫০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আগামী ২৬ জুন (শুক্রবার) কলকাতার রবীন্দ্র সদনে বিকাল ৫টায় 'সিটিজেন্স এমপাওয়ারমেন্ট ফোরাম'-এর পক্ষ থেকে 'পশ্চিমবঙ্গ : মহিমা, গরিমা, সম্ভাবনা'-শীর্ষক একটি ভব্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন'-এর সঙ্গে সহস্রকণ্ঠে রাষ্ট্রমাতার বন্দনা 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের মাধ্যমে স্বাধীনতা থেকে স্বতন্ত্রতার জয়যাত্রার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হবে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত থাকবেন নৈহাটির বিধায়ক ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর প্রজন্ম শ্রী সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা— রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহ শ্রী দুর্গাপ্রসাদ সাহু।

ইতি

শ্রী দেবাশিস লাহিড়ী

(ম্যানেজিং ট্রাস্টি, সিটিজেন্স এমপাওয়ারমেন্ট ফোরাম)

যোগাযোগ : ড. রাকেশ দাশ— ৯৭৪৮২৪৬৩০৫

ADVT.

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৮৬)

'তুল্যনিন্দা স্তুতির্মৌনী'

হায়দরাবাদে নিজামের হিন্দুদের উপর নির্যাতন ও হিন্দু বিরোধী নীতির কারণে অতিষ্ঠ হিন্দু সমাজ 'ভাগ্য নগর নিঃশস্ত্র প্রতিকার মণ্ডল' নামে একটি প্রতিবাদী সংস্থার প্রতিষ্ঠা করে (১৯৩৮) এবং যোজনাবদ্ধ ভাবে শুরু হয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন। সাভারকরের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা ও আর্য সমাজও এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ডাক্তারজীর কাছেও প্রস্তাব এল যে সঙ্ঘ স্বনামে এই সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করুক। এ বিষয়ে ডাক্তারীর মত ছিল ভিন্ন, ১৯৩০-৩১ সালে জঙ্গল সত্যাগ্রহের সময়ও তিনি এই নীতি অনুসরণ করেছেন। স্বয়ংসেবকরা সত্যাগ্রহের অনুমতি চাইলে তিনি সকলকে উৎসাহিত করতেন। কিন্তু সঙ্ঘের নামে নয়। তাঁর মত ছিল স্বয়ংসেবকরা যেমন সঙ্ঘের একজন, তেমনি তারা সমাজেরও সদস্য। যদি তারা সত্যি দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে তবে সমাজের যে কোনো বিপদে প্রয়োজনে তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই অংশগ্রহণ করবে। শুধু সঙ্ঘচালক বা তৎসমতুল্য পদাধিকারীদের বলতেন এমন সময়ে বাইরে থেকে উৎসাহিত করার জন্য। কারণ সমস্ত কার্যকর্তা জেলে চলে গেলে নিত্যকার সঙ্ঘ কার্যই অচল হয়ে যাবে। ১৯৩৮ সালে এই আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তি গজানন রাও কেতকরকে পত্রে আন্দোলনে মনোযোগ দেওয়ার জন্য বললেন। পুনায় এলে মামা দাতে, ভাউরাও মোডক আদি কার্য কর্তাদের এই প্রসঙ্গে বলেন— কমপক্ষে পাঁচশো লোককে সত্যাগ্রহে পাঠাতে হবে।

ডাক্তারজীর আত্মবিশ্বাস ও আন্তরিকতা দেখে তারা দৃঢ়তার সঙ্গে সম্মতি জানিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে পাঁচশো নয়, তার তিন চার গুণ স্বয়ংসেবক পরবর্তীতে এই সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু তবুও একশ্রেণীর ব্যক্তি এ বিষয়ে ডাক্তারজীর বেশ সমালোচনা শুরু করলেন। বিশেষ করে 'বোম্বাই'-এর মারাঠী 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা তো কয়েকটা প্রবন্ধে অহংকারী বলে ডাক্তারজীর কঠোর সমালোচনা করে। দেশভক্ত বাবারাও সাভারকর পত্রিকায় প্রতিবাদপত্রে সঙ্ঘের ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা করেন। তবুও 'বন্দে মাতরম্' ডাক্তারজী সম্পর্কে এক নিম্ন মানসিকতার সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করে (৭ জুন, ১৯৩৮)। এই দীর্ঘ সমালোচনার শেষ অংশে এমন কাজ থেকে বিরত থাকার কথা বলে উপদেশ দেওয়া হয়— 'আপনি যদি এমন করেন, তাহলে নামমাত্র হলেও হিন্দু সমাজের ভাবী ইতিহাসকাররা আপনার কথা অন্তত উল্লেখ করতে পারবে'। কয়েকজন স্বয়ংসেবক এই প্রবন্ধ ডাক্তারজীকে পড়ে শোনালেন। তিনি সজোরে হেসে বলেন— 'আমারও তাই ইচ্ছা। আমার নাম ইতিহাসে না থাকলেও চলবে, কিন্তু সঙ্ঘের উপর যারা এইভাবে আঘাত করছে তাদের অবশ্য পুরোপুরি নামোল্লেখ হওয়া উচিত।' এ ধরনের কদর্যতার প্রত্যুত্তরের পক্ষপাতী ডাক্তারজী কখনো ছিলেন না। তিনি বলতেন— নিরন্তর প্রত্যক্ষ প্রগতিশীল কার্যই এর প্রকৃত উত্তর। শুধু নিন্দা নয়, প্রশংসার ক্ষেত্রেও ডাক্তারজী এমনই নিরুদ্বেগ থাকতেন।

(৮৭)

সদা তৎপর সদা প্রস্তুত

ডাক্তারজীর মনে হয়েছিল সময়টা পরাধীন ভারতের পক্ষে সংঘর্ষ করার এক উপযুক্ত পরিবেশ। বিশ্ব প্রেক্ষাপটে জার্মানি ইংরেজদের বিরুদ্ধে। যথেষ্ট আক্রামক হয়ে উঠেছে তারা। এদিকে সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দল 'ফরোওয়ার্ড ব্লক' তৈরি করতে হয়েছে। ডাক্তারজীর এই পরিবেশকে বিপ্লবের অনুকূল পরিবেশ মনে হচ্ছিল এবং তিনি চাইছিলেন প্রকৃত দেশভক্ত, শৃঙ্খলাপরায়ণ, নিষ্ঠাবান যুবক তৈরির জন্য দেশের কোনায় কোনায় সঙ্ঘ শাখা বিস্তার করা হোক। তিনি তখন ভাবলেন পরীক্ষা করা প্রয়োজন, যেকোনো অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য স্বয়ংসেবকরা কতটা তৎপর বা প্রস্তুত আছে। পুনায় একদিন নগরের স্বয়ংসেবকদের বৈঠকে তিনি প্রশ্ন করলেন, তাৎক্ষণিক উপস্থিত হওয়ার বার্তা দিলে নগরের স্বয়ংসেবকরা নির্দিষ্ট স্থানে কতক্ষণে হাজির হতে পারবে। কেউ দু'ঘণ্টা, কেউ চার ঘণ্টা লাগবে বলে উত্তর দিল। ডাক্তারজী বললেন— কারও বাড়িতে আগুন লাগলে খবর দিলে যদি এত সময় লাগে আসতে তবে তো বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। পরের দিন ২০ জুন, ১৯৩৯ সাল, সকাল ৮টায় শিবাজী মন্দির ময়দানে ২ ঘণ্টার মধ্যে পূর্ণ গণবেশে সমস্ত স্বয়ংসেবককে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিতে মাননীয় সঙ্ঘচালক বিনায়ক রাও আপটেকে অনুরোধ করলেন। অত্যন্ত দ্রুত কার্যবাহ, শিক্ষক, গটনায়কদের মাধ্যমে এই নির্দেশ ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সকলে ঠিক ৮টায় ন'শো স্বয়ংসেবক পূর্ণ গণবেশে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়।

এই কাজ ডাক্তারজী মাঝে মাঝেই যেখানে যেতেন সঙ্ঘচালকদের মাধ্যমে স্বয়ংসেবকদের তৎপরতার প্রস্তুতি নিতেন। পরে কোনো প্রসঙ্গে তিনি এমন কাজের প্রেরণার বিষয়ে অকোলা জেলে থাকা এক অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। সেখানে একদিন দুপুরে খাবার সময় হঠাৎ বিপদঘণ্টা বাজানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে যে যেখানে যেমন অবস্থায় ছিল সেভাবেই ময়দানে এসে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ আধা খেয়ে, আধা স্নান করে, কেউ শুধু প্যান্ট পরে ছুটতে ছুটতে চলে আসে। তিনি ভাবলেন নিজের সরকারের অফিসাররা ডাক দেওয়া মাত্র সব কাজ ছেড়ে ছুটে আসার লোক আছে, তাই তারা হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসে আমাদের দেশ শাসন করার সামর্থ্য অর্জন করতে পারে। এরা সব বেতনভোগী। ডাক্তারজী অনুভব করলেন— 'কোনো কিছুর আশা না রেখে শুধু দেশভক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের সমস্ত ব্যক্তিগত কাজ এক পাশে সরিয়ে রেখে সঙ্ঘের আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকা ভিন্ন আমাদের দেশের দুর্দশা শেষ হবে না'। এ যেন এক অভ্রান্ত পথনির্দেশ।

সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস